মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৫তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

জুন ২০১২

মাসিক
আত-তাহরীক

১৫তম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বাঁচার পথ

আধুনিক জাহেলিয়াত তার সর্বগ্রাসী প্রতারণার জাল ফেলে মানবতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও বিচারব্যবস্থা সবই আল্লাহ বিরোধী। এমনকি ধর্মনীতিতেও জমাট বেঁধেছে ধর্মনেতাদের বানোয়াট রীতিনীতি ও অগণিত শিরক ও বিদ'আতের জঞ্জাল। আজ সত্যের হাত-পা বাঁধা। মিথ্যার রয়েছে বল্গাহীন স্বাধীনতা। এমতাবস্থায় মানুষের বাঁচার পথ কি? আমরা মনে করি, সামনে মাত্র তিনটি পথ খোলা রয়েছে। ১. পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বাতিলকে আঁকড়ে ধরা। ২. হক-এর উপর দৃঢ় থেকে বাতিলপন্থীদের হামলায় ছবর করা। ৩. বাতিলকে সাহসের সাথে মুকাবিলা করে হক-এর বিজয় লাভের পথ সুগম করা।

উপরোক্ত তিনটি পথের মধ্যে প্রথমটি কোন বাঁচার পথ নয়, বরং ওটা মরণের পথ। দ্বিতীয়টি সাময়িকভাবে গ্রহণ করা গেলেও স্থায়ীভাবে গ্রহণ করলে তার পরিণতি এটাই হবে যে, তিলে তিলে মরতে হবে। যার কোন ভবিষ্যত নেই। এখন কেবলমাত্র তৃতীয় পথটাই খোলা রয়েছে। আর তা হ'ল বাতিলের সাথে আপোষ করে নয়, বরং বাতিলের মুকাবিলা করে হক-এর বিজয়ের পথ সুগম করা। এখানে বিষয় হ'ল দু'টি। ১. বাতিলের মুকাবিলা করা এবং ২. বিজয়ের পথ সুগম করা। মুকাবিলার ক্ষেত্রে হক ও বাতিল দু'টিরই নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। বাতিলের প্রতিটি গলিপথে পাহারা বসানো নিয়ম হলেও হক কখনোই বাতিলের পথে যায় না। কেননা ওটাও বাতিলের পাতানো ফাঁদ মাত্র। যেমন বাতিলপন্থীরা হকপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা ও নানাবিধ নোংরামির আশ্রয় নিলেও হকপন্থীরা তা পারে না। হকপন্থীকে হক পথে থেকে বাতিলের মুকাবিলা করতে হবে ও আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করতে হবে। আল্লাহ চাইলে সাহায্য করবেন ও দুনিয়াবী বিজয় দান করবেন। আর পরাজিত হলে সেটা আগামী দিনের বিজয়ের সোপান হবে। তবে উভয় অবস্থায় হকপন্থীর জন্য আখেরাতের বিজয় সুনিশ্চিত। মক্কার নেতাদের দাবী অনুযায়ী কেবল কালেমা ত্যাগ করলেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) সারা আরবের নেতৃত্ব পেয়ে যেতেন। অবশেষে কেবল তাদের মূর্তিগুলোকে মেনে নিয়ে যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার আপোষ প্রস্তাবেও

তিনি রাযী হননি। ফলে তিনি বাহ্যত: পরাজিত হলেন ও মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মক্কার নেতাদের বিজয়ের হাসি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র আট বছরের মাথায় মুহাম্মাদ (ছাঃ) মক্কায় ফিরে আসেন বিজয়ীর বেশে। পুরা মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সেদিন বিনাযুদ্ধে তাঁর করতলগত হয় এবং সবাই তাঁর দ্বীন কবুল করে নেয়। এ বিজয় ছিল আদর্শের বিজয়। সত্যের বিজয়। যা স্রেফ আল্লাহ্‌র গায়েবী মদদেই সম্ভব হয়েছিল। অতএব হক-এর উপর দৃঢ় থেকেই বাতিলের মুকাবিলা করতে হবে। বাতিলের সাথে আপোষ করে বাতিলের দেখানো পথে গিয়ে কখনোই বাতিল হটানো যায় না। আর এটাই বাস্তব যে, হক ও বাতিল আপোষ করলে বাতিল লাভবান হয় এবং হক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাতিলের যুক্তিসমূহ বড়ই মনোহর ও লোভনীয়। তাই হকপন্থীরা অনেক সময় পদস্খলিত হয়। ব্যক্তি ও সাংগঠনিক জীবনে যার অসংখ্য প্রমাণ আমাদের সামনে রয়েছে এবং হরহামেশা ঘটছে। এমনকি বিভিন্ন দেশের ইসলামী নেতারা যারা সারা জীবন ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের জন্য কাজ করেছেন, অবশেষে বাতিলের পথ ধরে এগোতে গিয়ে বাতিলের হামলায় পরাভূত হয়েছেন। নিয়ত শুদ্ধ হলেও রাস্তা পরিবর্তন করায় শেষ মুহূর্তে তিনি পথভ্রষ্ট হলেন। আবার এমনও কিছু মানুষ এই উপমহাদেশেই ছিলেন, যারা স্রেফ আল্লাহ্‌র স্বার্থে লড়াই করেছেন নিজস্ব ঈমানী তেজে সর্বাধুনিক অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে। এমনকি বাঁশের কেল্লা দিয়ে কামানের গোলার মোকাবিলা করেছেন। তারা শহীদ হয়েছেন কিন্তু বাতিলের সঙ্গে আপোষ করেননি। ফলে তারাই হলেন জাতির প্রেরণা। তাদের সেই রক্তপিচ্ছিল পথ বেয়েই জাতি পরে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে।

'মুমিনকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব' *(রূম ৩০/৪৭)*। তাই বাহ্যিকভাবে পরাজিত হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তাঁর দায়িত্ব পালন করেননি *(নাঊযুবিল্লাহ)*। বরং এর অর্থ এই যে, বাহ্যিক এই পরাজয় তার ভবিষ্যত বিজয়ের সোপান। যা আল্লাহ্‌র ইলমে রয়েছে। কিন্তু বান্দার ইলমে নেই। মক্কায় যখন বেলালকে মেরে-পিটিয়ে হাত-পা বেঁধে নগ্নদেহে অগ্নিঝরা রোদে স্ফুলিংগ সদৃশ মরুবালুকার উপর পাথর চাপা দিয়ে নির্যাতন করা হ'ত, তখন নেতারা ভাবত, বেলালরা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর যখন বেলাল কা'বা গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে দরায কণ্ঠে আযান দিলেন, তখন মক্কার নেতাদের হৃদয় জ্বলে গেল। তারা বলে উঠল কি সৌভাগ্যবান আমাদের পিতারা! যে এই দৃশ্য দেখার আগেই তারা মারা গেছেন। ইয়াসির ও তার স্ত্রী সুমাইয়া মক্কায় যখন শহীদ হলেন, সাইয়িদুশ শোহাদা হামযা যখন ওহোদ প্রান্তরে শহীদ হলেন, তখন তারা জানতেন না যে, কিছুদিন পরেই তারা বিজয়ী হবেন ও মক্কা তাদের করতলগত হবে। আল্লাহ কিন্তু তাদের এই ত্যাগ ও কুরবানীর সাময়িক পরাজয়ের মাধ্যমে পরবর্তীতে স্থায়ী বিজয়ের পুরস্কার দান করেছেন। দুনিয়াতে বিজয়ের খবর না পেলেও জান্নাতে গিয়ে সকলে বিজয়ীদের মিলনমেলায় সমবেত হবেন। তাই মুমিন যদি লক্ষ্যচ্যুত না হয় এবং তার কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতিতে দৃঢ় থাকে, তাহ'লে জীবদ্দশায় হৌক বা মৃত্যুর পরে হৌক, তার জন্য বিজয় অবধারিত।

হক-এর বিজয়ে যিনি যতটুকু অবদান রাখবেন, তিনি ততটুকু প্রতিদান পাবেন। তিনি আল্লাহকে খুশী করার জন্য কাজ করবেন, অন্যের জন্য নয়। শয়তান নানা অজুহাত দেখিয়ে তাকে প্রতি পদে পদে বাধা দিবে এবং তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র পথের দাঈ শয়তানকে চিহ্নিত করবে এবং তাকে পদদলিত করে নিজ কর্তব্য সাধনে এগিয়ে যাবে। ৪র্থ হিজরীতে নাজদের নেতারা এসে তাদের এলাকায় দাওয়াতের জন্য লোক চাইল। তারা তাদের নিরাপত্তার ওয়াদা করল। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সরল বিশ্বাসে তাদের নিকটে ৭০ জন সেরা দাঈকে পাঠালেন। কিন্তু তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে সবাইকে হত্যা করল। কিন্তু বি'রে মাঊনার এই মর্মন্তুদ ঘটনা নিয়ে কেউ কথা তুলল না। নেতার ভুল ধরল না। দ্বীন পরিত্যাগ করে চলে গেল না। কারণ সবাই কাজ করেছেন আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন ও তার ইচ্ছায় শহীদ হয়েছেন। ফলে তারা হাসিমুখে জীবন দিয়েছেন। নবীর বিরুদ্ধে তাদের বা তাদের পরিবারের কারু কোন অভিযোগ ছিল না। বরং আল্লাহ্‌র পথে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে পেরে তারা ও তাদের পরিবারগুলি ছিল মহা খুশী।

অর্থ ও অস্ত্রধারী কপট শক্তিবলয়ের বিরুদ্ধে এখন প্রতিরোধের একটাই পথ খোলা আছে। আর তা হ'ল, আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় ঈমান রেখে বাতিলের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন প্রত্যয় ঘোষণা করা এবং ঈমানদারগণের মধ্যে সীসাঢালা সাংগঠনিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে একটি কুন-এর মাধ্যমে বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। যেমন ইতিপূর্বে মূসা ও তাঁর নিরস্ত্র সাথীদের বিরুদ্ধে বাতিলের শিখণ্ডী ফেরাঊন সসৈন্যে ডুবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তুমি হকপন্থীদের শক্তিশালী কর- আমীন! *(স.স.)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/২৪ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

নবী পত্নীদের মর্যাদা :

১. পবিত্র কুরআনে তাঁদেরকে يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ‘হে নবীর পত্নীগণ’ বলে সম্বোধন করে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে *(আহযাব ৩৩/৩০, ৩২)*। অন্যত্র أَزْوَاجِكَ ‘তোমার স্ত্রীগণ’ *(আহযাব ৩৩/২৮, ৫৯; তাহরীম ৬৬/১-২)* বলা হয়েছে। ‘যাওজ’ অর্থ জোড়া, সমতুল্য, সমপর্যায়ভুক্ত বস্তু, যেমন বলা হয়, زَوْجَا خُفٍّ ‘মোজার দু’টি অংশ’। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণকে তাঁর أَزْوَاج বলার মাধ্যমে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। অথচ امرأة (স্ত্রী) শব্দ বলা হয়নি, যা অন্যান্য নবী এবং নবী নন এমন সকলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে *(তাহরীম ৬৬/১০)*। যেমন- হযরত নূহ ও লূত (আঃ)-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ‘নূহের স্ত্রী, লূত্বের স্ত্রী’ বলা হয়েছে। অন্যদিকে ফেরাউনের স্ত্রীর ক্ষেত্রে, امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ *(তাহরীম ৬৬/১৪)* এবং আবু লাহাবের স্ত্রীর ক্ষেত্রে امْرَأَتُهُ *(লাহাব ১১১/৪)* করা হয়েছে। ইবরাহীমের স্ত্রীর ক্ষেত্রে امْرَأَتُهُ *(যারিয়াত ৫১/২৯)* এবং أَهْلَ الْبَيْتِ বা পরিবার *(হূদ ১১/৭৩)* দু’ধরনের শব্দ এসেছে। তবে যাকারিয়ার স্ত্রীর ক্ষেত্রে امْرَأَتِيْ *(মারিয়াম ১৯/৫)* এবং زَوْجَهُ *(আম্বিয়া ২১/৯০)* দু’টি শব্দ এসেছে। কিন্তু শেষনবীর স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে أَزْوَاج শব্দ খাছ করার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদাকে বিশেষভাবে সমুন্নত করা হয়েছে।

২. নবীপত্নীগণের মর্যাদা পৃথিবীর সকল মহিলার উপরে। যেমন আল্লাহ বলেন, لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ‘তোমরা অন্য কোন মহিলার মত নও’ *(আহযাব ৩৩/৩২)*। এখানে كَأَحَدٍ শব্দ ব্যবহার করায় নবী ও নবী নন, সকলের স্ত্রী ও সকল মহিলাকে বুঝানো হয়েছে। নবীপত্নীগণের উচ্চ মর্যাদায় স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত এই অনন্য সনদ নিঃসন্দেহে গৌরবের এবং একই সাথে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয় বিষয়।

৩. আল্লাহ নবীপত্নীগণকে নিষ্কলংক ঘোষণা করেছেন এবং তাদের গৃহকে সকল প্রকারের আবিলতা ও পংকিলতা হ’তে মুক্ত বলেছেন *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

৪. আল্লাহ নবীপত্নীগণের গৃহগুলিকে ‘অহীর অবতরণ স্থল’ (مهبط الوحي) হিসাবে ঘোষণা করেছেন *(আহযাব ৩৩/৩৪)*। যা তাঁদের মর্যাদাকে সবার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে।

৫. নবীর মৃত্যুর পরে তাঁরা সকলের জন্য ‘হারাম’ এবং তাঁরা ‘উম্মতের মা’ (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) হিসাবে চিরদিনের জন্য বরণীয় ও পূজনীয় *(আহযাব ৩৩/৫৩; ৩৩/৬)*। সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত এই মর্যাদা পৃথিবীর কোন মহিলার ভাগ্যে হয়নি। অতএব সত্যিকারের মুমিন সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিজের জীবনের চাইতে ভালবাসেন এবং তাঁর স্ত্রীগণকে মায়ের মর্যাদায় সম্মান প্রদর্শন করেন।

নবী পত্নীগণের সাথে নবীর উত্তম আচরণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ‘তোমাদের মধ্যে সেই-ই উত্তম, যে তার পরিবারের নিকটে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকটে উত্তম’।[১] এখানে পরিবার বলতে স্ত্রী বুঝানো হয়েছে।

‘সতীনের সংসার জাহান্নামের শামিল’ বলে একটা কথা সাধারণ্যে চালু আছে। কথাটি কমবেশী সত্য এবং বাস্তব। তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে নিবেদিতপ্রাণ পরিবারে তা কিভাবে শান্তির বাহনে পরিণত হয়, রাসূল-পরিবার ছিল তার অনন্য দৃষ্টান্ত। অন্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় পারিবারিক জীবনেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছিলেন উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ। কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা নিম্নে তা তুলে ধরার চেষ্টা পাব।

১. স্ত্রীগণের সাথে সমান ব্যবহার :

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান সহ যাবতীয় আচার-আচরণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর সকল স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন। সাধারণতঃ আছর ছালাতের পর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়ে অবহিত হতেন।[২]

২. তিনি স্ত্রীদের মধ্যে তাদের সম্মতিক্রমে সমভাবে পালা নির্ধারণ করতেন।[৩]

৩. কোন অভিযানে বা সফরে যাওয়ার সময় লটারির মাধ্যমে স্ত্রী বাছাই করে একজনকে সাথে নিতেন।[৪]

১. *তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৫২।*
২. *বুখারী হা/৫২১৬; মুসলিম হা/২৬৯৫।*
৩. *তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩২৩৫।*

৪. স্ত্রীগণের বান্ধবী ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন ও তাদের হাদিয়া-তোহফা দিতেন।[৫]

৫. স্ত্রীগণের প্রত্যেকের কক্ষ পৃথক ছিল। যেগুলিকে আল্লাহ পাক 'হুজুরাত' 'বুয়ূত' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন *(হুজুরাত ৪৯/৪; আহযাব ৩৩/৩৩)*।

৬. স্ত্রীগণের অধিকাংশ বড় বড় ঘরের মহিলা হ'লেও রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষাগুণে তাঁরা সবাই হয়ে উঠেছিলেন অল্পে তুষ্ট ও সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

৭. অন্যের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উপরে স্থান দেওয়ার অনন্য গুণে গুণান্বিতা এই সকল মহিয়সী নারীগণ। তাঁরা সম্পদ পায়ে লুটালেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। দানশীলতায় তারা ছিলেন উদারহস্ত। উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রাঃ) তো 'উম্মুল মাসাকীন' (মিসকীনদের মা) হিসাবে অভিহিত ছিলেন। খায়বর বিজয়ের পর বিপুল গণীমত হস্তগত হয়। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর প্রাপ্য অংশ হ'তে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য বছরে ৮০ অসাক্ব খেজুর এবং ২০ অসাক্ব যব বরাদ্দ করা হয়। সেই সাথে একটি করে দুগ্ধবতী উষ্ট্রী প্রদান করা হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, পবিত্রা স্ত্রীগণ যতটুকু না হ'লে নয়, ততটুকু রেখে বাকী সব দান করে দিয়েছেন।[৬]

৮. সপত্নীগণের মধ্যে পরস্পরের ভালোবাসা ছিল গভীর ও নিঃস্বার্থ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল ও দয়ার্দ্রচিত্ত। এরপরেও যদি কখনো কারু প্রতি কারু কোন রূঢ় আচরণ প্রকাশ পেত, তাহ'লে দ্রুত তা মিটিয়ে ফেলা হ'ত। যেমন (ক) একবার রাসূল (ছাঃ)-এর একমাত্র ইহুদীজাত স্ত্রী ছাফিয়াকে হযরত যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) 'ইহুদী' বলে সম্বোধন করেন, যার মধ্যে তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। এতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এতই ক্ষুব্ধ হন যে, যয়নব (রাঃ) তওবা করে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার গৃহে পা মাড়াননি।[৭] (খ) আরেকদিন রাসূল (ছাঃ) ঘরে এসে দেখেন যে, ছাফিয়া কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, হাফছা (রাঃ) আমাকে 'ইহুদীর মেয়ে' বলেছেন। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) ছাফিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বরং তুমি নিশ্চয়ই নবী (ইসহাকের) কন্যা। নিশ্চয়ই তোমার চাচা (ইসমাঈল) একজন নবী এবং নিশ্চয়ই তুমি একজন নবীর স্ত্রী। তাহলে কিসে তোমার উপরে সে গর্ব করছে? অতঃপর তিনি হাফছাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর হে হাফছা!'[৮]

(গ) আয়েশা (রাঃ) বলেন, লোকেরা আয়েশার পালার দিন ঠিক রাখত। ঐদিন তারা রাসূল (ছাঃ)-কে খুশী করার জন্য হাদিয়া পাঠাতো। স্ত্রীগণ দু'দলে বিভক্ত ছিলেন। আয়েশা, হাফছা, ছাফিয়া ও সওদা এক দলে এবং উম্মে সালামাহ ও বাকীগণ আরেক দল। শেষোক্ত দলের স্ত্রীগণের অনুরোধে উম্মে সালামাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে একদিন বললেন, আপনি লোকদের বলে দিন, তারা যেন আপনি যেদিন যে স্ত্রীর কাছে থাকেন, সেদিন সেখানে হাদিয়া পাঠায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে উম্মে সালামাহ! তুমি আমাকে আয়েশার ব্যাপারে কষ্ট দিয়ো না। উম্মে সালামা তওবা করলেন। পরে তারা উক্ত বিষয়ে ফাতেমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পাঠালেন। সেখানেও রাসূল (ছাঃ) একই জবাব দিলেন এবং বললেন, ফাতেমা! আমি যা পসন্দ করি, তুমি কি তা পসন্দ কর না? তাহ'লে তুমি আয়েশাকে ভালবাস।[৯]

এইসব ছোটখাট বিষয় যখন হাদীছের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তখন এসবের চাইতে বড় কিছু ঘটলে নিশ্চয়ই তা রেকর্ড হয়ে থাকত। কিন্তু সে ধরনের কিছু পাওয়া যায় না বিধায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, নবীপত্নীগণের মধ্যে সদ্ভাব ও সহৃদয়তা খুবই গাঢ় ছিল এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বোত্তম মর্যাদাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত সাধাসিধা। তিনি স্বেচ্ছায় দরিদ্রতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বলতেন, اللَّهُمَّ أَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীনী হালে বাঁচিয়ে রাখো ও মিসকীনী হালে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে মিসকীনদের সাথে পুনরুত্থিত কর'।[১০] তবে সে দারিদ্র্যের কষাঘাত ছিল এত কঠোর যে, সাধারণ কোন মহিলার পক্ষে তা সহ্য করা ছিল রীতিমত কষ্টকর। তবুও নবীপত্নীগণ তা হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, فَمَا أَعْلَمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ 'আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কখনো কোন পাতলা নরম রুটি দেখেছেন কিংবা কোন আস্ত ভুনা বকরী দেখেছেন'।[১১] মা আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, মদীনায় আসার পর তিনদিন একটানা রুটি কখনো খেতে

---

৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩২।*
৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৭৭।*
৬. *এক অসাক্ব সমান ১৫০ কেজি।*
৭. *আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০৪৯; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৮৩৫, সনদ হাসান।*
৮. *তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬১৮৩, সনদ ছহীহ।*
৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৮০ 'মর্যাদা সমূহ' অধ্যায়-৩০, 'নবীপত্নীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ-১১।*
১০. *তিরমিযী, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫২৪৪; ছহীহাহ হা/৩০৮।*
১১. *বুখারী হা/৫৪২১; মিশকাত হা/৪১৭০।*

পাইনি।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'পরপর দু'মাস অতিবাহিত হয়ে তৃতীয় মাসের চাঁদ উদিত হ'ত, অথচ নবীগৃহে কোন (চুলায়) আগুন জ্বলতো না। (অর্থাৎ মাসভর চুলা জ্বলতো না)। ভগ্নীপুত্র উরওয়া বিন যুবায়ের জিজ্ঞেস করলেন, খালাম্মা! مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ তাহ'লে কি খেয়ে আপনারা জীবন ধারণ করতেন? তিনি বলেন, الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ 'দু'টি কালো বস্তু দিয়ে- খেজুর এবং পানি'।[১৩] নবীজীবনের সর্বশেষ রাতেও স্ত্রী আয়েশাকে চেরাগ জ্বালাতে প্রতিবেশীর নিকট থেকে তৈল নিতে হয়েছিল।[১৪] মূলতঃ এসবই ছিল তাঁর যুহ্দ বা দুনিয়াত্যাগী চরিত্রের নিদর্শন মাত্র।

এই কঠিন কৃচ্ছ্রতা সাধনের মধ্যেও পবিত্রা স্ত্রীগণ কখনোই মুখে অসন্তুষ্টি ভাব প্রকাশ করতেন না। বরং সর্বদা মহান স্বামীর সাহচর্যে হাসিমুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করতেন। তবে দু'একটি ঘটনা এমন ছিল যা রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছার বিরোধী ছিল এবং তাতে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। হ'তে পারে শরী'আতী বিধান চালু করার লক্ষ্যে আল্লাহ্র বিশেষ ইচ্ছায় এরূপ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। যার মধ্যে রয়েছে উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়। যেমন ৫ম হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পর বনু কুরায়যার বিজয় এবং গণীমতের বিপুল মালামাল প্রাপ্তির ফলে মুসলমানদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ প্রেক্ষিতে পবিত্রা স্ত্রীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তাদের খাদ্য-বস্ত্র ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির আবেদন জানান। এতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মর্মাহত হন এবং তাদেরকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন। উক্ত মর্মে আয়াতে 'তাখয়ীর' নাযিল হয় *(আহযাব ৩৩/২৮-২৯)*।

এ আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশাকে তার পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ করতে বললে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলে ওঠেন, এজন্য পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের কি আছে? আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও আখেরাতকে কবুল করে নিয়েছি'।[১৫] তাঁর এই স্পষ্ট জবাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুবই খুশী হ'লেন এবং অন্যান্য স্ত্রীগণ সকলেই আয়েশার পথ অনুসরণ করলেন।

উপরোক্ত ঘটনায় পুণ্যবতী স্ত্রীগণের এই বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় পুণ্যবান স্বামীর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে থাকেন। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মানুষ হিসাবে মানবীয় রাগ-অভিমান ও দুঃখ-বেদনার অধিকারী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের সম্পর্ক এসবের মাধ্যমে মাঝে-মধ্যে ঝালাই হয়ে আরও দৃঢ়তর হয়। রাসূল ও তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণের মধ্যকার এ ধরনের ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভবিষ্যতে কোন মুমিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটলে তারা যেন রাসূল-পত্নীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং সংসার ভেঙ্গে না দিয়ে আরও মযবুত করেন, সেদিকে পথপ্রদর্শনের জন্যই আল্লাহ্র ইচ্ছায় উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল উন্নত আদর্শ চেতনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বাবস্থায় তাঁরা নবীপত্নী হিসাবে বরিত *(যুখরুফ ৪৩/৭০ আয়াতের মর্মার্থ)*। তাই দুনিয়াবী ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তাঁরা কখনোই আখেরাতের বৃহত্তম স্বার্থ বিকিয়ে দিতে পারেন না। দুনিয়াতে তাঁরা ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর পারিবারিক জীবনের বিশ্বস্ততম সাক্ষী এবং তাদের মাধ্যমেই উম্মতে মুহাম্মাদী ইসলামের পারিবারিক ও অন্যান্য বিধান সমূহ জানতে পেরে ধন্য হয়েছে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে তাঁরা কেবল নবীপত্নী ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন উম্মতের শিক্ষিকা ও নক্ষত্রতুল্য দৃষ্টান্ত। নিঃসন্দেহে নবীর সঙ্গে নবীপত্নীগণের সম্পর্ক ও আচার-আচরণ ছিল অতীব মধুর এবং স্বর্গীয় চেতনায় উজ্জীবিত।

রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ সৌষ্ঠব

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেহাবয়ব ছিল অতীব সুন্দর, সুঠাম ও মধ্যমাকৃতির। (১) তাঁর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল ও গৌর-গোলাপী (২) পূর্ণ গণ্ডদ্বয় সহ মুখমণ্ডল ছিল লম্বাটে গোলাকার (২) সুশৃংখল দন্তরাজির সম্মুখ ভাগের উপরে দু'টি দাঁতের মাঝে কিছুটা ফাঁক ছিল (৪) প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, কিঞ্চিত রক্তাভ ও বিস্ফারিত সুরমা চক্ষু। পৃথক অথচ পরস্পরে বিজড়িত চিকন ভ্রুযুগল (৫) দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট বড় আকৃতির মাথা, যা ছিল ঘনকৃষ্ণ কেশবেষ্টিত। যা না অধিক কোঁকড়ানো ছিল, না অধিক খাড়া ছিল। যা বাবরী ছিল। মৃত্যু পর্যন্ত মাথার মধ্যবর্তী স্থানের কিছু চুল এবং ঠোঁটের নিম্ন দেশের ও দাড়ির কিছু চুল শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল। দাড়িতে মেহেদী রং ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন যে, চুল-দাড়িতে কালো রং ব্যবহারকারী ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। তিনি নিয়মিত চিরুনী ব্যবহার করতেন এবং মাথার চুল দু'দিকে ভাগ করে দিতেন (তাতে মাঝখানে সিঁথি হয়ে যেত) (৬) গোফ ছোট ও দাড়ি ছিল দীর্ঘ ও ঘন সন্নিবেশিত (৭) দেহের জোড় সমূহ এবং স্কন্ধের অস্থিসমূহ ছিল বড় আকারের (৮) চর্বির আধিক্যহীন সুশোভন উদরদেশ (৯) প্রসারিত বক্ষপুট হতে নাভি দেশ পর্যন্ত ছিল স্বল্প লোমের প্রলম্বিত রেখা (১০) হস্ত ও পদদ্বয় ছিল মাংসল এবং গোড়ালি ছিল

১২. *বুখারী হা/৫৪১৬ 'খাদ্য' অধ্যায় 'নবী (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ কিভাবে খাওয়া-দাওয়া করতেন' অনুচ্ছেদ-২৩।*
১৩. *বুখারী হা/৬৪৫৯ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'রাসূল ও ছাহাবীদের জীবন যাপন কেমন ছিল' অনুচ্ছেদ-১৭।*
১৪. *আহমাদ, ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/২৬৫৩।*
১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৯।*

পাতলা। পথ চলার সময় সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে চলতেন। যেন কোন ঢালু স্থানে অবতরণ করছেন (১১) হাতের কব্জিদ্বয় ও আঙ্গুলগুলো ছিল কিছুটা বড় আকারের, তালুদ্বয় ছিল প্রশস্ত ও মোলায়েম (১২) দুই স্কন্ধ ছিল প্রলম্বিত। যার মাঝে বাম কাঁধের অস্থিমুখে ছিল কবুতরের ডিমের আকৃতির ছোট মাংসপিণ্ড- 'মোহরে নবুঅত'। গাত্রবর্ণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উক্ত মোহরের উপরে ছিল চর্মতিল সমষ্টির ন্যায় সবুজ রেখা (১৩) শক্ত, সমর্থ ও শক্তিশালী দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী এই সুন্দর মানুষটির দেহ বৃদ্ধ বয়সে কিছুটা ভারি হয়ে গিয়েছিল। তাই সিজদায় বেশীক্ষণ থাকতে পারতেন না। শেষ বৈঠকে বসে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ ধরে দো'আ করতেন। (১৪) দেহ নিঃসৃত স্বেদবিন্দু সমূহ মুক্তার ন্যায় পরিদৃষ্ট হ'ত এবং যা ছিল মিশকে আম্বরের চাইতে সুগন্ধিময়। একবার গ্রীষ্মের দুপুরে ঘুমন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর দেহনিঃসৃত ঘর্মসমূহ বাটিতে জমা করেছিলেন খালা উম্মে সুলায়েম (রাঃ)। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি করবে? জবাবে তিনি বলেন, এগুলি আমাদের সুগন্ধির সাথে মিশাবো। কেননা এগুলি অধিক সুগন্ধিময়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর ব্যবহারের দ্বারা আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য বরকত আশা করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ঠিকই করেছ'।[১৬] (১৫) প্রফুল্ল অবস্থায় তাঁর মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় চমকিত হ'ত। রাগান্বিত হ'লে তা ডালিমের ন্যায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত। ঘর্মাক্ত অবস্থায় তা উজ্জ্বলতায় ঝলমলিয়ে উঠত।

(ক) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্দর চেহারার প্রশংসায় চাচা আবু তালেব বলেছিলেন,

وأبيضَ يُستسقى الغَمَام بوجهه * ثِمالُ اليتامى عِصْمَةٌ للأرامل

'গৌরবর্ণের মুহাম্মাদ। যার চেহারার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। যিনি ইয়াতীমের আশ্রয়স্থল ও বিধবাদের রক্ষক'।[১৭]

(খ) আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলতেন,

أمين مصطفى بالخير يدعو * كضوء البدر زايله الظلام

'বিশ্বস্ত, মনোনীত, কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন। পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় যা অন্ধকার দূরীভূত করে'।[১৮]

(গ) ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা দেখে যুহায়ের বিন আবী সুলমার নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করতেন, যা তিনি তার নেতা হারাম বিন সেনানের প্রশংসায় বলেছিলেন,

لو كنت من شيء سوى البشر * كنت المضيء لليلة البدر

'যদি আপনি মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু হ'তেন, তাহ'লে আপনিই পূর্ণিমার রাত্রিকে আলো দানকারী হ'তেন'।[১৯]

কা'ব বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আনন্দিত হ'তেন, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তাঁর চেহারা যেন চন্দ্রের টুকরা (قطعة قمـــر) হয়ে যেত। আমরা এটা বুঝতে পারতাম'।[২০] মোটকথা প্রশংসাকারীর ভাষায় রাসূল (ছাঃ) ছিলেন, لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর ন্যায় সুন্দর কাউকে দেখিনি'। ফারসী কবির ভাষায়,

حسن يوسف دم عيسى يد بيضا داري * آنچه خوبه هم دارند تو تنها داري

'ইউসুফের রূপ, ঈসার ফুঁক ও মূসার শুভ্র তালু
সবই আছে তোমার মাঝে হে প্রিয় রাসূল'। *-(খোদ অনুবাদ)*

রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ পাক নিজেই স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِـيْمٍ 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ 'আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য'।[২১] তাই দেখা যায়, নবুঅত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সংবেদনশীলতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা, করুণা ও

১৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৮৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ।*
১৭. *বুখারী হা/১০০৮-৯ 'ইস্তিস্কা' অধ্যায়-১৫ 'খরার সময় ইমামের নিকট বৃষ্টির জন্য দো'আর আবেদন করা' অনুচ্ছেদ-৩।*
১৮. *বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত হা/২৩৮ পৃঃ ১/২৭০।*
১৯. *কানযুল উম্মাল হা/১৮৫৭০; আছ ছাখাবী, আল ওয়াফী বিল অফায়াত /২৯ পৃঃ।*
২০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৯৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ।*
২১. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৫০৯৬।*

ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا 'নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখেরাতকে কামনা করে ও বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্য সমূহ পূর্ণভাবে বর্ণনা করা ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করা এবং খালি চোখে আকাশের তারকারাজি গণনা করা অসম্ভব। তবুও দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু চারিত্রিক নমুনা ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

(১) বাকরীতি : তিনি সাধারণতঃ চুপ থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। যতটুকু বলতেন বিশুদ্ধ মার্জিত ও সুন্দরভাবে বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত। আর একেই লোকেরা জাদু বলত। তাঁর শুদ্ধভাষিতায় মুগ্ধ হয়েই ইয়ামনের যেমাদ আযদী মুসলমান হয়ে যান।[২২] তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও 'তিনি ছিলেন আরব ও অনারবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ'।[২৩] এমনকি 'হাদীছ জাল হবার অন্যতম নিদর্শন হ'ল তার শব্দসমূহের উচ্চমান বিশিষ্ট না হওয়া' *(ফাতহুল মুগীছ)*। একারণেই আরবী সাহিত্যে কুরআন ও হাদীছের প্রভাব সবার উপরে। বরং বাস্তব কথা এই যে, কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ বাকরীতি ও আলংকরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হ'তে পেরেছে এবং ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। অথচ ল্যাটিন, হিব্রু, সংস্কৃত প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা সমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্তির পথে।

(২) ক্রোধ দমন শৈলী : ক্রোধ দমনের এক অপূর্ব ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি বলতেন, প্রকৃত বীর সেই, যে নিজের ক্রোধকে দমন করতে পারে।[২৪] আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি কখনো কাউকে নিজের স্বার্থে নিজ হাতে মারেননি। কোন মহিলা বা খাদেমকে কখনো প্রহার করেননি'।[২৫]

(৩) হাসি-কান্না : তিনি মৃদু হাস্য করতেন। কখনোই অট্টহাস্য করতেন না। সদা প্রফুল্ল থাকতেন। কখনোই গোমড়া মুখো থাকতেন না। ছোটখাট রসিকতা করতেন। (ক) একদিন এক নওমুসলিম ইহুদী বৃদ্ধাকে স্ত্রী আয়েশার নিকটে বসা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আয়েশা তোমার সাথীকে বল যে, বৃদ্ধরা কখনো জান্নাতে যাবে না। একথা শুনে উক্ত মহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে বললেন, ভয় নেই! জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সবাই যুবক বয়সী হবে।[২৬] (খ) এক সফরে তিনি দেখেন যে, মহিলাদের নিয়ে জনৈক উষ্ট্র চালক দ্রুত উট হাকিয়ে যাচ্ছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, رُوَيْدَا رِفْقًا بِالْقَوَارِيْرَ 'ধীরে চালাও। কাঁচের পাত্রগুলির প্রতি সদয় হও'।[২৭]

ছালাতের মধ্যে বিশেষ করে তাহাজ্জুদের ছালাতে তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদতেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে তার অন্তর কেঁদে উঠতো এবং তার অভাব দূরীকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। চাচা হামযা, কন্যা যয়নব ও পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে তিনি শিশুর মত হু হু করে কেঁদেছিলেন। একবার ইবনু মাসঊদের মুখে কুরআন তেলাওয়াত শুনে তাঁর চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এমনকি নিসা ৪১ আয়াতে পৌঁছলে তিনি তাকে থামতে বলেন।[২৮]

(৪) বীরত্ব ও ধৈর্যশীলতা : কঠিন বিপদের মধ্যেও তিনি দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ধৈর্যশীল থাকতেন। মাক্কী জীবনের অসহায় অবস্থায় এবং মাদানী জীবনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মধ্যেও তাঁকে কখনো ভীত-বিহ্বল ও অধৈর্য হ'তে দেখা যায়নি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঘনঘোর যুদ্ধের বিভীষিকাময় অবস্থায় আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থাকতেন'। শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার কোন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই। অভাবে-অনটনে, দুঃখে-বেদনায়, সর্বাবস্থায় তিনি কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করতেন। এমনকি তিনদিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে সৈন্যদের সাথে অবর্ণনীয় কষ্টে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিলেও চেহারায় তার প্রকাশ ঘটতো না। বরং সৈন্যদের সাথে আখেরাতের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই খুশী মনে নিজ হাতে খন্দক খুঁড়েছেন। শত্রুদের শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পেত তাঁর ধৈর্যশীলতা ততই বেড়ে যেত। ওহোদ ও হোনায়েন যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও অসম সাহসিকতা ছিল অতুলনীয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। এসময় তাঁর উপর মোটা আঁচলের একটি নাজরানী চাদর শোভা পাচ্ছিল। হঠাৎ একজন বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এমন হেচকা টান দেয় যে, রাসূল (ছাঃ) বেদুঈনের বুকে গিয়ে পড়েন। এতে আমি দেখলাম যে, রাসূল (ছাঃ)-এর ঘাড়ের উপর চাদরের আঁচলের দাগ পড়ে গেল। লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর মাল যা তোমার কাছে আছে, সেখান থেকে আমাকে দেবার নির্দেশ দাও (يَا

২২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০।*
২৩. *মুক্বাদ্দামা ফাতহুল মুলহিম শারহু মুসলিম পৃঃ ১৬।*
২৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১০৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ২০ অনুচ্ছেদ।*
২৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১৮।*
২৬. *রাযীন, মিশকাত হা/৪৮৮৮, সনদ ছহীহ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ১২ অনুচ্ছেদ।*
২৭. *বুখারী হা/৬১৪৯; মুসলিম হা/৪২৮৭-৮৯।*
২৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯৫।*

(مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ)। তখন রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন ও হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দান করার আদেশ দিলেন'।[২৯]

উক্ত ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় ধৈর্য ও দানশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

(৫) সেবা পরায়ণতা : কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে রোগীকে পরিচর্যা করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। তার জন্য দো'আ করতেন। কি খেতে মন চায় জিজ্ঞেস করতেন। ক্ষতিকর না হ'লে তা দেবার ব্যবস্থা করতেন। নিজের ইহুদী কাজের ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন ও পরিচর্যা করেন।[৩০]

(৬) সহজপন্থা অবলম্বন : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহকে যখনই দুইটি কাজের এখতিয়ার দেওয়া হ'ত, তখন তিনি সহজটি বেছে নিতেন। যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকত। তিনি নিজের জন্য কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্য হ'লে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তেন না'।[৩১] ওয়ায-নছীহত এমনভাবে করতেন, যাতে মানুষ বিব্রতবোধ না করে।[৩২] নফল ছালাত চুপে চুপে আদায় করতেন, যাতে অন্যের কষ্ট না হয়। তিনি বলতেন, فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُــوْنَ 'তোমরা এমনভাবে ইবাদত কর, যা তোমরা সহজে করতে পার'।[৩৩]

(৭) দানশীলতা : তাঁর দানশীলতা ছিল নদীর স্রোতের মত। যতক্ষণ তাঁর কাছে কিছু থাকত, ততক্ষণ তিনি দান করতেন। রামাযান মাসে তা হয়ে যেত كَالرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ 'বায়ু প্রবাহের ন্যায়'। তিনি ছাদাক্বা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু হাদিয়া নিতেন। অথচ তা নিজের প্রয়োজনে যৎসামান্য লাগিয়ে সবই দান করে দিতেন। তিনি বলতেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّـــى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْـــسِه 'কেউ অতক্ষণ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে অপরের জন্য সেই বস্তু ভালবাসবে, যা নিজের জন্য ভালবাসবে'।[৩৪] তিনি বলতেন, وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْــدٍ أَبَــدًا 'একজন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা কখনো একত্রিত হ'তে পারে না'।[৩৫]

(৮) লজ্জাশীলতা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখতেন। কখনোই অন্যের উপরে নিজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। আকাশের চাইতে মাটির দিকে দৃষ্টি অবনত রাখাকেই তিনি শ্রেয় মনে করতেন। তিনি কারু মুখের উপর কোন অপসন্দনীয় কথা বলতে লজ্জা পেতেন। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِه.

'তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতে লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কিছু অপসন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে আমরা বুঝে নিতাম'।[৩৬] কারু কোন মন্দ কাজ দেখলে সরাসরি তাকে মন্দ না বলে সাধারণভাবে নিষেধ করতেন, যাতে লোকটি লজ্জা না পায়। অথচ বিষয়টি বুঝতে পেরে সংশোধন হয়ে যায়।

(৯) বিনয় ও নম্রতা : তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তিনি সবাইকে মানুষ হিসাবে সমান জ্ঞান করতেন। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করতেন না। তাঁকে দেখে ছাহাবীগণকে সম্মানার্থে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন।[৩৭] তিনি সকলের সাথে একইভাবে মাটিতে বসে পড়তেন। দাস-দাসীদের নিকটে কখনোই অহংকার প্রকাশ করতেন না। তাদের কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে উহ্ শব্দ করতেন না। বরং তাদের কাজে সাহায্য করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ১০ বছর রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমাকে কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত তলব করেননি।[৩৮] তিনি সর্বদা আগে সালাম দিতেন ও মুছাফাহার জন্য আগে হাত বাড়িয়ে দিতেন। ছাহাবীগণকে সম্মান করে অথবা আদর করে তাদের উপনামে ডাকতেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওছমানকে আবুবকর (রাঃ), আব্দুর রহমানকে আবু হুরায়রা (রাঃ), আলীকে আবু তোরাব ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, খুশী অবস্থায় উপনামে ডাকা আরবীয় রীতি ছিল।

(ক) নফল ছালাত অবস্থায় কোন মেহমান এলে তিনি সংক্ষেপে ছালাত শেষ করে কথা বলে নিতেন। তারপর পুনরায় ছালাতে রত হ'তেন। দুগ্ধদায়িনী মাতা, রোগী, বৃদ্ধ,

---

২৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮০৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।*
৩০. *বুখারী, মিশকাত হা/১৫৭৪ 'জানায়েয' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।*
৩১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮১৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।*
৩২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৭।*
৩৩. *বুখারী হা/১৯৬৬ 'ছাওম' অধ্যায়-৩০ 'ছাওমে বেছালে বাড়াবাড়ির শাস্তি' অনুচ্ছেদ-৪৯।*
৩৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৬১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ।*
৩৫. *তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮২৮ 'জিহাদ' অধ্যায়।*
৩৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮১৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।*
৩৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৮।*
৩৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮০১।*

মুসাফির ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি জামা'আতে ছালাত সংক্ষেপ করতেন।[৩৯]

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর 'আযবা' (عـضباء) নাম্নী একটা উষ্ট্রী ছিল। সে এতই দ্রুতগামী ছিল যে, কোন বাহন তাকে অতিক্রম করতে পারত না। কিন্তু একদিন এক বেদুঈনের সওয়ারী আযবা-কে অতিক্রম করে গেল। বিষয়টি মুসলমানদের কাছে কষ্টদায়ক মনে হ'ল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ 'দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র নীতি এটাই যে, কাউকে উঁচু করলে তাকে নীচুও করে থাকেন'।[৪০]

(গ) একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলকে خير البرية ('সৃষ্টির সেরা') বলে সম্বোধন করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 'ওই মর্যাদা হ'ল ইবরাহীম (আঃ)-এর'।[৪১]

(ঘ) একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّيْ لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ 'স্থির হও! কেননা আমি কোন বাদশাহ নই। আমি একজন কুরায়েশ মহিলার সন্তান মাত্র। যিনি শুকনা গোশত ভক্ষণ করতেন'।[৪২] উল্লেখ্য যে, আরবের গরীব লোকেরা শুকনা গোশত খেতেন। এ সকল ঘটনায় বাস্তব জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের ও নিরহংকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

(১০) সংসার জীবনে : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিজেই জুতা সেলাই করতেন ও পট্টি লাগাতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, সংসারের কাজ নিজ হাতে করতেন, নিজে বকরী দোহন করতেন, কাপড় ছাফ করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন'।[৪৩]

স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন কুমারী ও সবচেয়ে কম বয়স্কা। তাই রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো তার সাথে দৌড়ে পাল্লা দিতেন।[৪৪] তাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে বেদুঈন মেয়েদের নাচগান শুনেছেন।[৪৫] রাসূল (ছাঃ) যে কত বাস্তববাদী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন, এতে তার প্রমাণ মেলে। একবার এক সফরে স্ত্রী ছাফিয়াকে উটে সওয়ার করার জন্য তিনি নিজের হাটু পেতে দেন। ছাফিয়া নবীর হাটুর উপরে পা রেখে উটে সওয়ার হন।[৪৬]

(১১) সমাজ জীবনে : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। নিজের ও স্ত্রী সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করতেন। কারু ক্ষতি হ'তে পারে এমন কাজ থেকে দূরে থাকতেন। পরনিন্দা ও পরচর্চা হ'তে বেঁচে থাকতেন। সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি শত্রুদের দেওয়া কষ্টে ও মূর্খদের বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করতেন। তিনি মন্দকে মন্দ বলতেন, ভালকে ভাল বলতেন। কিন্তু সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। সর্বদা তিনি সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতেন। তাঁর নিকটে লোকেদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি তাঁর করুণা ছিল সর্বাধিক। তিনি বলতেন, ابْغُونِيْ الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ 'তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে তালাশ করো। কেননা তোমরা রূযিপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক দুর্বল শ্রেণীর মাধ্যমে'।[৪৭]

কারু মানহানিকর কথা তিনি বলতেন না।

সমাজ সংস্কারে তিনি জনমতের মূল্যায়ন করতেন। যেমন-

(১) কুরায়েশদের নির্মিত কা'বাগৃহে ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত কা'বাগৃহ থেকে কিছু অংশ ছেড়ে রাখা হয়েছিল। ছাড়া অংশটিকে 'রুকনে হাত্বীম' বলা হয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) চেয়েছিলেন ওটাকে ইবরাহীমী কা'বার ন্যায় কা'বাগৃহের মধ্যে শামিল করতে এবং কা'বা গৃহের দরজা দু'টো করতে। কিন্তু জনমত বিগড়ে যাবার আশংকায় তা করেননি। তিনি একদিন আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابٌ يَخْرُجُوْنَ 'যদি তোমার কওম নতুন মুসলিম না হ'ত, তাহ'লে আমি কা'বা ভেঙ্গে দিতাম এবং এর দু'টি দরজা করতাম। একটি দিয়ে মুছল্লীরা প্রবেশ করত এবং অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে যেত'।[৪৮] অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন হাত্বীমকে অন্তর্ভুক্ত করে মূল ইবরাহীমী ভিতের উপর কা'বাগৃহ নির্মাণ করতে। যা মাটি সমান হবে এবং যার পূর্ব দরজা দিয়ে মুছল্লী প্রবেশ করবে ও ছালাত শেষে পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কুরায়েশরা তা না করে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে। যাতে তাদের ইচ্ছার

৩৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩১, ৩৪, ২৯।*
৪০. *বুখারী হা/৬৫০১ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়-৮১ 'নম্রতা' অনুচ্ছেদ-৩৮।*
৪১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮৯৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ।*
৪২. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩১২, সনদ ছহীহ।*
৪৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮২২ সনদ ছহীহ।*
৪৪. *ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৯ সনদ ছহীহ।*
৪৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৪৪; বুখারী, মিশকাত হা/৩১৪০।*
৪৬. *বুখারী, হা/২২৩৫ 'সফর' অধ্যায়।*
৪৭. *আবুদাউদ হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৫২৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৭৯।*
৪৮. *বুখারী হা/১২৬।*

বাইরে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে।' খালা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এ হাদীছ শোনার পর আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে ৬৪ হিজরী সনে কা'বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর ইচ্ছা অনুযায়ী তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ৯ বছর পর ৭৩ হিজরীতে উমাইয়া গবর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা ভেঙ্গে আগের মত নির্মাণ করেন। যার আকৃতি আজও রয়েছে। বলা বাহুল্য এর দ্বারা রাজনীতি বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর আকাংখার বাস্তবায়ন আজও ঘটেনি এবং মূল ইবরাহীমী ভিতে কা'বা আজও ফিরে আসেনি।

(২) মদীনায় মুনাফিকদের অপতৎপরতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকটাকে (ইবনু উবাইকে) শেষ করে দিই। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, না। তাতে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছেন'।[৪৯]

তিনটি নীতি অবলম্বন : তিনি নিজের জন্য তিনটি নীতিকে আবশ্যিক করে নিয়েছিলেন- (১) الريـــاء রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো কোন কাজ না করা (২) الاكثـــار আধিক্য পরিহার করা (৩) ترك مالا يعينه অনর্থক কথা ও কাজ এড়িয়ে চলা।

অন্যের ব্যাপারেও তিনি তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন- (১) কাউকে নিন্দা করা (২) লজ্জা দেওয়া (৩) ছিদ্রান্বেষণ করা।

বৈঠকের নীতি :

বৈঠকে কোনরূপ অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন সকলে নীরবে তা শুনতেন। কেউই তাঁর সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেন না। তাঁর কথা শেষ না হ'লে কেউ কথা বলত না। তিনি সর্বদা এমন কথাই বলতেন, যাতে ছওয়াব আশা করা হ'ত। কেউ তাঁর প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখালে তিনি তার জন্য সর্বোত্তম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেন। বেদুঈনদের রূঢ় আচরণে তিনি ধৈর্য অবলম্বন করতেন। বলা চলে যে, তাঁর এই বিনম্র ব্যবহার ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবগণ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ 'আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফলে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি কর্কশভাষী ও রূঢ় হৃদয় হ'তেন, তাহ'লে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। রাসূল (ছাঃ)-এর এ অনন্য চরিত্র মাধুর্য ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বিশেষ দান।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, অতি বড় দুশমনও রাসূল (ছাঃ)-কে কখনো অসৎ বলেনি। কিন্তু তারা কুরআনী বিধানকে মানতে রাযী হয়নি। স্বেচ্ছাচারিতায় অভ্যস্ত পুঁজিবাদী গোত্রনেতারা ইসলামের পুঁজিবাদ বিরোধী ও ন্যায়বিচারভিত্তিক অর্থনীতি, গোত্রীয় সমাজনীতি এবং আখেরাতভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত জীবনাচারকে মেনে নিতে পারেনি। আর সে কারণেই তো আবু জাহল রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছিল, إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت بـــه 'আমরা তোমাকে মিথ্যা বলি না। বরং তুমি যে ইসলাম নিয়ে এসেছ, তাকে মিথ্যা বলি'। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়,

فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ

'বস্তুতঃ ওরা আপনাকে মিথ্যা বলে না। বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*।[৫০] এমনকি এইসব লোকেরা কুরআন পরিবর্তনের দাবীও করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (يونس ١٥)-

'আর যখন তাদের কাছে আমাদের স্পষ্ট আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার দীদার কামনা করে না তারা বলে যে, এটি ব্যতীত অন্য কুরআন নিয়ে এসো অথবা এটাকে পরিবর্তন কর। আপনি বলে দিন যে, একে নিজের পক্ষ হ'তে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল অনুসরণ করি যা আমার নিকটে অহী করা হয়। স্বীয় পালনকর্তার অবাধ্যতায় আমি কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি' *(ইউনুস ১০/১৫)*। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, إِنَّـــكَ لَعَلَى هُـــدًى مُـــسْتَقِيمٍ 'নিশ্চয়ই আপনি সরল-সঠিক পথের উপরে আছেন' *(হজ্জ ২২/৬৭)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর পুরা জীবন ছিল কুরআনের বাস্তব চিত্র। সেকারণ একদা মা আয়েশাকে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেছিলেন, كَانَ خُلُقُـــهُ

৪৯. *তিরমিযী হা/৩৩১৫ সনদ ছহীহ।*

৫০. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩৪, সনদ মুরসাল।*

اَلْقُـرْآنَ 'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন'।[৫১] অর্থাৎ তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব রূপকার। হাদীছের পাতায় পাতায় যার দৃষ্টান্ত সমূহ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কুরআন ও হাদীছ তাই মুসলিম জীবনের চলার পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন চরিত অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন!

জীবন্ত মু'জেযা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনে আমরা বহু মু'জেযার কথা জেনেছি। যার সবই ছিল তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে যেগুলির অবলুপ্তি ঘটেছে। যেমন অন্যান্য নবীগণের বেলায় ঘটেছে। অথবা তাদের কিতাব সমূহ পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে গেছে। যেমন তাওরাত ও ইনজীল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পরেও যে মু'জেযা জীবন্ত হয়ে আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা চির জাগরুক থাকবে, তা হ'ল তাঁর আনীত কালামুল্লাহ আল-কুরআনুল হাকীম। বিশ্ব মানবতার চিরন্তন পথপ্রদর্শক হিসাবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যা দুনিয়াবাসীর জন্য তাঁর শেষনবীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন এবং যা মানব জাতির আমানত হিসাবে রক্ষিত আছে এবং চিরকাল থাকবে। যতদিন পৃথিবী থাকবে, মানবজাতি থাকবে, ততদিন কুরআন থাকবে অবিকৃত ও অক্ষুণ্নভাবে। রাসূল (ছাঃ)-এর ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের বাঁকে বাঁকে আসমানী তারবার্তা হিসাবে কুরআন নাযিল হয়েছে পরম্পরাগতভাবে। নুযূলে কুরআনের শুরু থেকে নবুঅতের শুরু এবং নুযূলে কুরআনের সমাপ্তিতে নবী জীবনের সমাপ্তি। তাই নবীচরিত আলোচনায় কুরআনের আলোচনা অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়ে। নবী করীম (ছাঃ) চলে গেছেন। রেখে গেছেন কুরআন। কিন্তু কি আছে সেখানে? এক্ষণে আমরা কুরআনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলী সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

কুরআনের পরিচয় :

কুরআনের প্রধানতম পরিচয় হ'ল এই যে, এটি 'কালামুল্লাহ' বা আল্লাহ্র কালাম। যা সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে।[৫২] সৃষ্টিজগত দুনিয়াবী চোখে কখনোই তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে দেখতে পাবে না *(আন'আম ৬/১০৩)*। তবে তাঁর 'কালাম' দেখে, পড়ে, শুনে ও বুঝে হেদায়াত লাভ করতে পারবে। কুরআনের ভাব ও ভাষা, এর প্রতিটি বর্ণ, শব্দ ও বাক্য আল্লাহ্র। জিব্রীল ছিলেন বাহক[৫৩] এবং রাসূল (ছাঃ) ছিলেন প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা।[৫৪] এ কুরআন 'সুরক্ষিত ফলকে' লিপিবদ্ধ ছিল।[৫৫] সেখান থেকে আল্লাহ্র হুকুমে ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়েছে।[৫৬]

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পর বিগত সকল নবীর নবুঅত শেষ হয়ে গিয়েছে এবং কুরআন অবতরণের পর বিগত সকল ইলাহী কিতাবের হুকুম ও কার্যকরিতা রহিত হয়ে গেছে। ঈসা (আঃ) সহ বিগত সকল নবীই শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন *(ছফ ৬১/৬)* এবং তাঁরা শেষনবীর আমল পেলে তাঁকে সর্বান্তকরণে সাহায্য করবেন বলে আল্লাহ্র নিকটে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন *(আলে ইমরান ৩/৮১)*। সে হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) কেবল আখেরী যামানার নবী নন, বরং তিনি ছিলেন বিগত সকল নবীর নবী। অনুরূপভাবে তাঁর আনীত কিতাব ও শরী'আত বিগত সকল কিতাব ও শরী'আতের সত্যায়নকারী[৫৭] এবং পূর্ণতা দানকারী *(মায়েদাহ ৫/৩)*। অতএব কুরআন বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র এলাহী কিতাব এবং সকল মানুষের জন্য একমাত্র পথপ্রদর্শক ইলাহী গ্রন্থ।

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম হ'ল 'কুরআন'। যার অর্থ 'পরিপূর্ণ' যেমন قَرَأَتِ الْحَـوْضُ 'হাউস কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে'। সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণভাবে সঞ্চিত হওয়ার কারণে কালামুল্লাহকে 'কুরআন' বলা হয়েছে। ইবনুল ক্বাইয়িম একথা বলেন। আল্লাহ বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَـدْلاً 'আপনার প্রভুর কালাম সত্য ও ন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ' *(আন'আম ৬/১১৫)*। অর্থাৎ কুরআনের প্রতিটি কথাই সত্য এবং প্রতিটি বিধানই ন্যায় ও ইনছাফে পরিপূর্ণ।

(ক্রমশঃ)

---

৫১. *মুসনাদে আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১।*
৫২. *নিসা ৪/৮২, আন'আম ৬/১১, আ'রাফ ৭/৩৫, হামীম সাজদাহ ৪১/৪২; ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭৭-৮২; হাক্বাহ ৬৯/৪৩; দাহর ৭৬/২৩।*
৫৩. *বাক্বারাহ ২/৯৭; শু'আরা ২৬/১৯৪; তাকভীর ৮১/১৯।*
৫৪. *মায়েদাহ ৫/৬৭; নাহল ১৬/৪৪, ৬৪।*
৫৫. *বুরূজ ৮৫/২১-২২।*
৫৬. *হামীম সাজদাহ ৪১/৪২; ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৮০।*
৫৭. *বাক্বারাহ ২/৪১, ৯১, ৯৭; আলে ইমরান ৩/৩, ৫০; নিসা ৪/৪৭; মায়েদাহ ৫/৪৮; ফাত্বের ৩৫/৩১; আহক্বাফ ৪৬/৩০।*

পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

ভূমিকা :

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং ইবাদতের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন, যা কুরআন ও হাদীছ গ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান। আর সকল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল ছালাত, যা পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত বৈধ নয়। এ কারণে সকল মুহাদ্দিছ এবং ফক্বীহগণ ত্বাহারাহ বা পবিত্রতা অধ্যায় দিয়ে কিতাব লিখা শুরু করেছেন। অতএব পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হ'ল।-

الطهارة (ত্বহারাহ্)-এর আভিধানিক অর্থ : النظافة، والنزاهة، والنقاوة অর্থাৎ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতা।[৫৮]

الطهارة (ত্বহারাহ্)-এর পারিভাষিক অর্থ : পারিভাষিক অর্থে الطهارة (ত্বহারাহ্) দু'টি অর্থ প্রদান করে। যথা :

১- طهارة معنوية তথা অর্থগত দিক থেকে পবিত্রতা : তা হ'ল طهارة القلب অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করা থেকে নিজের অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং আল্লাহ তা'আলার মুমিন বান্দার উপর হিংসা-বিদ্বেষ ও গোপন শত্রুতা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

আর এটা কোন অপবিত্র বস্তু থেকে শরীর পবিত্র করার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিরক দ্বারা অপবিত্র শরীরকে পানি দ্বারা ধৌত করে পবিত্র করা সম্ভব নয়। যদিও বাহ্যিক দিক থেকে তার শরীর অপবিত্র নয়। অর্থাৎ তার শরীর স্পর্শ করলে কেউ অপবিত্র হবে না এবং তার উচ্ছিষ্ট অপবিত্র নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ 'হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক বা অপবিত্র' *(তওবা ২৮)*।

২- الطهارة الحسية তথা অনুভবযোগ্য বাহ্যিক পবিত্রতা : তা হ'ল, رفع الحدث و زوال الخبث অর্থাৎ শরীরের অপবিত্রতা এবং শরীরে লেগে থাকা অপবিত্র বস্তু দূর করা।

ব্যাখ্যা : ১- رفع الحدث তথা শরীরের নাপাকী দূর করা। অর্থাৎ যে সকল কারণ ছালাত আদায়ে বাধা প্রদান করে তা হ'তে পবিত্রতা অর্জন করা। এটা দুই প্রকার। যথা :

(ক) حدث أصغر তথা ছোট নাপাকী। যা থেকে কেবল ওযূর মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। যেমন পেশাব-পায়খানা এবং বায়ু নিঃসরণ হ'লে ওযূর মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করে ছালাত আদায় করা যায়।

(খ) حدث أكبر তথা বড় নাপাকী। যা থেকে গোসল ব্যতীত পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়। যেমন- স্ত্রী সহবাস করলে অথবা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। এ অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়।

২- زوال الخبث তথা শরীরে লেগে থাকা নাপাকী দূর করা। অর্থাৎ পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি শরীরে বা কাপড়ে লেগে গেলে পানি দ্বারা ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা।[৫৯]

পবিত্রতা অর্জনের হুকুম : নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা সক্ষম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 'তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ' *(মুদ্দাছছির ৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেছেন, وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ- 'আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম' *(বাক্বারাহ ১২৫)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না'।[৬০]

পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

(ক) বান্দার ছালাত ছহীহ্ হওয়ার পূর্বশর্ত হ'ল পবিত্রতা অর্জন করা। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে তার ছালাত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ না করে'।[৬১]

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৫৮. আল-মু'জামুল ওয়াসীত, (বৈরুত : দারু এহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী), পৃঃ ৩৮৭।

৫৯. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/২৫-৩২; ফিক্বহুল মুয়াস্সার, পৃঃ ১।

৬০. মুসলিম, হা/২২৫, মিশকাত, হা/২৮১।

(খ) আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীর প্রশংসা করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে' *(বাক্বারাহ ২২২)*।

আল্লাহ মসজিদে কুবার অধিবাসীদের প্রশংসা করে বলেন, فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ- 'সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(তওবা ১০৮)*।

(গ) কবরের কঠিন আযাব থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হ'ল অপবিত্র বস্তু থেকে দূরে থাকা। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ-

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এই দুই ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করছে। কিন্তু তারা বড় কোন অপরাধের কারণে শাস্তি ভোগ করছে না। তার মধ্যে এই ব্যক্তি প্রসাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর এই ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়াত'।[৬২]

পানি সংক্রান্ত মাসআলা

যে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ:

পবিত্রতা অর্জনের জন্য ঐ পানির প্রয়োজন যে পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্র করতে সক্ষম। উল্লেখ্য যে, পানি তিন প্রকার। যথা-

(ক) طَهُوْرٌ (ত্বাহূর): অর্থাৎ যে পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্র করতে সক্ষম। অর্থাৎ যে পানির রং, স্বাদ, গন্ধ কিছুই পরিবর্তন হয়নি। যেমন- বৃষ্টির পানি, নদীর পানি, সাগরের পানি, বরফের পানি, কূপের পানি, ঝরণার পানি, নলকূপের পানি ইত্যাদি। কেবলমাত্র এই প্রকার পানি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ 'আর আকাশ হ'তে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন' *(আনফাল ১১)*।

তিনি অন্যত্র বলেছেন, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا 'আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি' *(ফুরক্বান ৪৮)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্রে (নৌকায়) আরোহণ করেছি এবং আমরা সঙ্গে অল্প কিছু পানি নিয়েছি। যদি আমরা সেই পানি দ্বারা ওযূ করি তাহ'লে আমরা পিপাসিত হব। অতএব আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা ওযূ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার (সমুদ্রের) পানি পবিত্র এবং তার মধ্যেকার মৃত হালাল।[৬৩]

(খ) طَاهِرٌ (ত্বাহের): অর্থাৎ যে পানি নিজে পবিত্র। কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারে না। যেমন- পেপসি, ফলের জুস, দুধ মিশানো পানি ইত্যাদি। এগুলো নিজে পবিত্র কিন্তু কোন অপবিত্রকে পবিত্র করতে পারে না। অর্থাৎ এগুলো দ্বারা ওযূ বৈধ নয় এবং শরীরে কোন নাপাকী লেগে গেলে এগুলো দ্বারা ধৌত করাও বৈধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ-

'আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ কর' *(মায়েদা ৬)*। অতএব যদি পানি ব্যতীত জুস, পেপসি ইত্যাদি দ্বারা ওযূ জায়েয হ'ত তাহ'লে পানি না পেলে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিতেন না। বরং পানি জাতীয় জিনিস দ্বারা ওযূ করার নির্দেশ দিতেন।

(ঘ) نَجَسٌ (নাজাস): অর্থাৎ যে পানি নিজে পবিত্র নয় এবং অন্যকেও পবিত্র করতে পারে না। এমন পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয নয়।

পানির সাথে অপবিত্র বস্তুর মিশ্রণ হ'লে তার হুকুম :

পানি কম হোক কিংবা বেশী হোক তার সাথে অপবিত্র বস্তুর মিশ্রণের ফলে যদি রং, স্বাদ ও গন্ধ এই তিনটি গুণের কোন একটির পরিবর্তন হয়, তাহ'লে সেই পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। এই পানি ব্যবহার করা জায়েয নয় এবং তা অন্যকে পবিত্র করতেও সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে যদি রং, স্বাদ ও গন্ধ

৬১. *বুখারী, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হবে না' অনুচ্ছেদ, হা/১৩৫, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১/৮৫; মুসলিম, হা/২২৫। মিশকাত, হা/২৮০, বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয়া ২/৪৮।*

৬২. *আবু দাউদ, হা/২০, নাসাঈ, হা/৩১, ৬৯, ইবনু মাজাহ, হা/৩৪৭, হাদীছ ছহীহ।*

৬৩. *আবু দাউদ হা/৮৩; তিরমিযী হা/৬৯; নাসাঈ হা/৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩২৪৬।*

এই তিনটি গুণের সবগুলি ঠিক থাকে তাহ'লে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ يُلْقَى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি 'বুযাআ' কূপের পানি দ্বারা ওযূ করতে পারি? অথচ তা এমন একটি কূপ, যাতে হায়েযের নেকড়া, মরা কুকুর ও পূতিগন্ধময় আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, পানি পবিত্র, কোন জিনিসই তাকে অপবিত্র করতে পারে না।[৬৪]

পানির সাথে পবিত্র বস্তুর মিশ্রণ হ'লে তার হুকুম :

পানির সাথে যদি কোন পবিত্র বস্তুর মিশ্রণ হয়। যেমন- বৃক্ষের পাতা, সাবান, কুল বা বরই ইত্যাদি এবং রং, স্বাদ, গন্ধ এই তিনটি গুণের সবগুলোই ঠিক থাকে তাহ'লে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ। কিন্তু যদি উল্লিখি তিনটি গুণের কোন একটি নষ্ট হয়ে যায় তাহ'লে সেই পানি طَاهِرٌ তথা পবিত্র বটে কিন্তু তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ নয়।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ تُوُفِّيَت ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ-

উম্মু আতিয়্যাহ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কন্যা যায়নাব (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাঁকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর বা কিছু কর্পূর ব্যবহার করবে...।[৬৫] অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, পবিত্র বস্তুর মিশ্রণে পানি অপবিত্র হয় না।

গরম পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের হুকুম :

(ক) যদি কোন অপবিত্র বস্তুকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে পানি গরম করা হয়। অর্থাৎ যদি কেউ গাধা বা ঘোড়ার পায়খানা জমা করে এবং তাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে পানি গরম করে এবং পাত্রের মুখ খোলা থাকে, তাহ'লে তা মাকরূহ বা অপসন্দনীয়। কেননা অপবিত্র বস্তু নিসৃত ধোঁয়া ঐ পানিতে পতিত হওয়ার ফলে তার গন্ধ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পক্ষান্তরে যদি পাত্রের মুখ বন্ধ করা থাকে, তাহ'লে তাতে কোন সমস্যা নেই।[৬৬]

(খ) যদি কোন পবিত্র বস্তুকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে পানি গরম করে অথবা সূর্যের তাপে পানি গরম করে, তাহ'লে তাতে কোন সমস্যা নেই।[৬৭]

ব্যবহারিক পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের হুকুম :

ব্যবহারিক পানি অর্থাৎ ওযূ অথবা গোসল করার সময় ওযূর অঙ্গসমূহ থেকে গড়িয়ে পড়া পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ। তবে শর্ত হ'ল রং, স্বাদ ও গন্ধ ঠিক থাকতে হবে।

হাদীছে এসেছে,

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِه.

উরওয়া (রহঃ) মিসওয়ার (রহঃ) প্রমুখের নিকট হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন। এ উভয় বর্ণনা একটি অন্যটির সত্যায়ন স্বরূপ। নবী (ছাঃ) যখন ওযূ করতেন তখন তাঁর ব্যবহৃত পানির উপর তাঁরা (ছাহাবায়ে কেরাম) যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তেন'।[৬৮]

অন্য হাদীছে এসেছে,

وَقَالَ أَبُو مُوْسَى دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا-

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) একটি পাত্র আনালেন যাতে পানি ছিল। অতঃপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং তার দ্বারা কুলি করলেন। অতঃপর তাদের দু'জন [আবু মূসা ও বেলাল (রাঃ)]-কে বললেন, তোমরা এ থেকে পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে ঢাল।[৬৯]

অতএব যদি ব্যবহারিক পানি পবিত্র না হ'ত তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন নির্দেশ দিতেন না এবং ছাহাবায়ে কেরাম এমন কাজ করতেন না। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ তাঁদের স্ত্রীদের সাথে একত্রে একই পাত্র হ'তে ওযূ করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

---

৬৪. মুসনাদে আহমাদ ৩/১৫; আবু দাউদ হা/৬১; নাসাঈ হা/২৭৭; মিশকাত হা/৪৪৮; বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১১৫।

৬৫. বুখারী 'বরই পাতার পানি দিয়ে মৃতকে গোসল ও ওযূ করানো' অনুচ্ছেদ, হা/১২৫৩, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২/৮।

৬৬. শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/৩৩-৩৪।

৬৭. শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/৩৫।

৬৮. বুখারী, 'ওযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার' অনুচ্ছেদ, হা/১৮৯, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১০৯।

৬৯. বুখারী, 'ওযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার' অধ্যায়, হা/১৮৮, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১০৯।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُوْنَ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْعًا-

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল-এর সময় পুরুষ এবং মহিলা একত্রে (এক পাত্র হ'তে) ওযূ করতেন।[৭০]

মানুষ এবং গৃহপালিত পশুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র কি?

প্রথমত ঃ মানুষের উচ্ছিষ্ট, অর্থাৎ খাওয়া ও পান করার পরে যা অবশিষ্ট থাকে তা পবিত্র। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় পান করতাম, অতঃপর তা নবী (ছাঃ)-কে দিতাম, আর তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখেই পান করতেন। আর কখনও আমি হায়েয অবস্থায় হাড়ের গোশত খেতাম, অতঃপর তা আমি নবী (ছাঃ)-কে দিতাম, আর তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে খেতেন।[৭১] অতএব মানুষের উচ্ছিষ্ট সর্বাবস্থায়ই পবিত্র।

দ্বিতীয়ত ঃ পশুর উচ্ছিষ্ট : গৃহপালিত পশু যার গোশ্ত খাওয়া হালাল তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র। যা ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত।

পক্ষান্তরে যে সকল পশুর গোশত খাওয়া হারাম সে সকল পশুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র অথবা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে ছহীহ মত হ'ল, কুকুর এবং শুকুর ব্যতীত অন্য সকল পশুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ أَخِيْ فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ-

কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালেক যিনি আবু কাতাদার পুত্রবধূ ছিলেন। তার থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা (তার শ্বশুর) আবু কাতাদা তাঁর নিকট গেলেন। তিনি তাঁর জন্য ওযূর পানি ঢাললেন। তখন একটি বিড়াল আসল এবং তা হ'তে পান করতে লাগল, আর তিনি পাত্রটি বিড়ালটির জন্য কাত করে ধরলেন, যে পর্যন্ত না সে পান করল। কাবশা বলেন, তখন তিনি আমাকে দেখলেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছি। এটা দেখে তিনি বললেন, হে ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। তা তোমাদের পাশে ঘন ঘন বিচরণকারী অথবা বিচরণকারিণী। (সুতরাং এর উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়)।[৭২]

তবে পানির পরিমাণ যদি দুই কুল্লা-এর কম হয় এবং ঐ সকল পশুর খাওয়া ও পান করার ফলে রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহ'লে তা অপবিত্র হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بِالْفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল সেই পানি সম্পর্কে, যা মাঠে-বিয়াবানে জমে থাকে। আর পর পর তা হ'তে নানা ধরনের বন্য জীব-জন্তু ও হিংস্র পশু পানি পান করতে থাকে। উত্তরে তিনি বললেন, 'পানি যখন দুই কুল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা নাপাক হয় না'।[৭৩]

আর কুকুর এবং শূকরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তাকে সাতবার ধৌত কর এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা'।[৭৪]

অতএব কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র না হ'লে রাসূল (ছাঃ) সাতবার ধৌত করার নির্দেশ দিতেন না। আর শূকরের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَإِنَّهُ رِجْسٌ 'নিশ্চয়ই তা অপবিত্র' *(আন'আম ১৪৫)*।

[চলবে]

৭০. *বুখারী, 'ওযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার' অনুচ্ছেদ, হা/১৯৩, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১১১।*

৭১. *মুসলিম, হা/৩০০, মিশকাত, 'হায়েয' অধ্যায়, হা/৫০২, বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয়া ২/১৪২।*

৭২. *আবু দাউদ, 'বিড়ালের উচ্ছিষ্ট' অনুচ্ছে, হা/৭৫, তিরমিযী, হা/৯২, মিশকাত, হা/৪৫১, বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয় ২/১১৭।*

৭৩. *মুসনাদে আহমাদ, ২/২৭, আবু দাউদ, হা/৬৩, মিশকাত, হা/৪৪৭, বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয়া ২/১১৪।*

৭৪. *বুখারী, হা/১৭২, মুসলিম, হা/২৭৯, মিশকাত, হা/৪৫৮, বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয়া ২/১২১।*

আল্লাহ্র সতর্কবাণী

*রফীক আহমাদ**

আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় ও অসীম সত্তার অধিকারী। আর মানুষ হ'ল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি। তিনি মানুষকে শয়তান হ'তে সাবধান থাকার পুনঃ পুনঃ নির্দেশ প্রদান করেছেন। কুরআন এলাহী গ্রন্থ। এ গ্রন্থে আল্লাহ ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক-সাবধান করেছেন।

পবিত্র কুরআনের বাণী সমূহের প্রতি আস্থাশীল ও অকৃত্রিম বিশ্বাসী থাকার আহ্বান জানান হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কেউ কল্পনাপ্রসূতভাবে নিত্যনতুন কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হ'লে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। এখানে এই ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণীর অবতারণা করা হ'ল। মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে সতর্ককারীরূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মাধ্যমেই মানুষকে হুঁশিয়ার করেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْراً وَنَذِيْراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ– 'আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি' *(ফাতির ২৩-২৪)*।

একই মর্মার্থে অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ–

'বলুন, আমি তো কোন নতুন রাসূল নই। আমি জানি না আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি অহি করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ নই' *(আহক্বাফ ৯)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَّمُبَشِّراً وَنَذِيْراً، وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيْراً، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيْراً، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلاً–

'হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহ্র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়ক রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। আপনি মুসলমানদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করুন। আল্লাহ কার্যনির্বাহী রূপে যথেষ্ট' *(আহযাব ৪৫-৪৮)*।

একই বিষয়ে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ–

'বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, মার্জনাকারী। বলুন, এটি এক মহাসংবাদ' *(ছোয়াদ ৬৫-৬৭)*।

মানুষকে শয়তানের ব্যাপক প্রভাব ও আধিপত্যের বেড়াজাল হ'তে রক্ষার জন্য তাদেরকে সতর্ক করে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيْناً– 'আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(বানী ইসরাঈল ৫৩)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 'যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ' *(হা-মীম সাজদাহ ৩৬)*।

মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি ও ধর্মীয় বিধানাবলী। স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত এই বিধানাবলীর বিপরীত কাজ করার কোন অবকাশ নেই মানব সম্প্রদায়ের। তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলা বহু সতর্কবাণী দ্বারা মানব জাতিকে বারংবার সাবধান করেছেন এবং তাদের পথপ্রদর্শক মহানবী (ছাঃ)-কেও সতর্ক করা হয়েছে তাঁর উম্মতের স্বপক্ষে। উপরের আয়াতগুলো তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। মহানবী (ছাঃ)-এর প্রতি অর্পিত অপরিসীম গুরুদায়িত্বের প্রেক্ষাপটে তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রত্যক্ষ সতর্ককারী হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কুরআনে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র অস্তিত্বের বিকল্প যে কোন প্রকারের ধারণা হ'তে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এই সতর্কবাণীর সঠিক মূল্যায়নকারী মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সুসংবাদ এবং অবমূল্যায়নকারী কাফির ও মুনাফিকদের বর্জন করার সংবাদও দেওয়া হয়েছে। অতঃপর সকল অপকর্মের হোতা শয়তান হ'তে সাবধান থাকার সবিশেষ প্রত্যাদেশ এসেছে। শয়তান যে কোন পরিস্থিতিতে দুর্বল বান্দাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে এবং শক্তিশালী বান্দাকেও আক্রমণের চেষ্টা করতে পারে।

**শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

এমতাবস্থায় আল্লাহ্র শরণাপন্ন হওয়া বা আল্লাহ্র সমীপে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

অপরদিকে মহানবী (ছাঃ)-এর বাণী ও জীবনাদর্শ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একইভাবে অনুসরণযোগ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ, নির্দেশ ও সতর্কবাণীর পাশাপাশি মহানবী (ছাঃ)-এর আদেশ, নির্দেশ ও সতর্কবাণীরও যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। নইলে আমাদের জীবনের সকল সৎকর্ম সমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيْراً، لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً– 'আমি আপনাকে (রাসূল) প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারী রূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সম্মান ও সাহায্য কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর' *(ফাতাহ ৭-৯)*।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনার পরিণতি ভয়াবহ। যারা কাফের তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ বলেন, وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْراً، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً– 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাফেরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান' *(ফাতাহ ১৩-১৪)*।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার পরিণাম ভাল নয়; তাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্টতায় নিপতিত বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيْناً– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের ক্ষমতা নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৬)*।

পবিত্র কুরআন করীমের ব্যাখ্যা ও মর্মানুযায়ী একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হক সব চাইতে বেশী। স্বয়ং মহান আল্লাহ তা'আলা নিজ কালামে তাঁর আদেশ মান্য করার সাথে সাথে রাসূলের আদেশও মান্য করার হুকুম দিয়েছেন। অতঃপর যারা তাঁর ও রাসূলের আদেশ অমান্য করবে বা তাঁদেরকে অবিশ্বাস করবে, তাদের ভয়াবহ পরিণতির বিষয়টিও উপরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোন ঈমানদার পুরুষ বা ঈমানদার নারী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনে ভিন্নমত পোষণ করে না। একমাত্র অবিশ্বাসীরাই ভ্রষ্টতায় পতিত হয়। এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَى–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা অস্বীকার করেছে তারা ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার দ্বীনের আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করবে সেই অস্বীকার করে' *(বুখারী হা/৭২৮০)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বাক্য একটি, আর আমি বলেছি দ্বিতীয়টি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সমকক্ষ আছে বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করে সে আগুনে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে। আর আমি বলেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সমকক্ষ অস্বীকার করে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(বুখারী)*।

পবিত্র কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর হাদীছ হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কার্যাবলীর বিবরণ ও তাঁর বক্তব্যের অথবা আল-কুরআনের বাস্তব রূপ। ছহীহ বুখারীর উপরোল্লিখিত হাদীছ দু'টি মহানবী (ছাঃ)-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সতর্কবাণীর প্রমাণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহানবী (ছাঃ)-এর যাবতীয় হাদীছ সংরক্ষিত হয়েছে। সুতরাং পবিত্র কুরআন ও হাদীছ উভয় সতর্কবাণীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। এসব হাদীছের সমর্থনপুষ্ট আরও বহু আয়াত রয়েছে।

আখিরাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে সকল কর্ম বাতিল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে বলেন, وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ– 'বস্তুতঃ যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াত সমূকে এবং আখেরাতের সাক্ষাৎকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল সে করত' *(আ'রাফ ১৪৭)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ 'অতঃপর তার চেয়ে বড় যালেম কে আছে, যে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তাঁর আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে? কস্মিনকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না' *(ইউনুস ১৭)*।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّيْ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، وَ أَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمَ- 'আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু এবং এটাও জানিয়ে দিন যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(হিজর ৪৯-৫০)*। এ সকল আয়াতে আল্লাহ্র সতর্কবাণী বিদ্যমান।

আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন থাকলে শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ- 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় (ভুলে থাকে), আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সেই হয় তার সঙ্গী' *(যুখরুফ ৩৬)*।

পবিত্র কুরআনের এই অভাবনীয় বাণী একদিকে মানবতাকে আল্লাহ্র স্মরণে ডুবে থাকার আহ্বান জানিয়েছে, অপরদিকে সতর্কতা অবলম্বনের ঐকান্তিক দীক্ষাও প্রদান করেছে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম সুরক্ষায় আল্লাহ্র স্মরণ যেমন অপরিহার্য, অনুরূপভাবে আল্লাহ্র সতর্কবাণীর অনুসরণও একইভাবে প্রয়োজন। ইহকালীন জীবনের পরিসমাপ্তির পর পরকালীন জীবনে প্রবেশ মুহূর্তেই আল্লাহ্র সতর্কবাণীর প্রভাব প্রতিফলিত হবে। আর বিশ্বস্ত বান্দাদের পক্ষেই এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা সম্ভব। অতঃপর এদেরকে কল্যাণের পথে ফিরানোর লক্ষ্যেই পবিত্র কুরআনে এই সতর্কবাণী সম্বলিত আয়াতগুলো সংযোজন করা হয়েছে।

বস্তুত সকল সতর্কবাণীর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে সংশোধনের মাধ্যমে তাদের মুক্তির পথে পরিচালিত করা। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى-

'আমার দায়িত্ব পথপ্রদর্শন করা। আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। অতএব আমি তোমাদেরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে। যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না, তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতিত, সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে' *(আল-লায়ল ১২-২১)*।

উপরের আয়াতগুলোতে অপরাধীদের লক্ষ্য করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের অর্থাৎ জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহভীরু ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণকারীদের পুরোপুরি অভয় দেওয়া হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অমূল্যবাণী তথা হাদীছ পৃথকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে হাদীছ গ্রন্থে। পবিত্র কুরআনের সতর্ক বাণীর ন্যায়, হাদীছ গ্রন্থেও বহু সতর্কবাণী রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীছ পেশ করা হ'ল,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ، وَفِيْهِ دَخَنٌ. قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِى، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ-

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, এতে আমার পতিত হওয়ার ভয়ে। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মূর্খতা ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ কল্যাণ (ঈমান) দান করেছেন, তবে কি এ কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ (সংঘটিত) হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ হবে। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পরেও কি পুনরায় কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে। তবে তা ধূয়াযুক্ত (নির্ভেজাল) হবে। জিজ্ঞেস করলাম, দুখান (ধূ'য়া) অর্থ কি? তিনি বললেন, লোকেরা আমার পথ ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন করবে। তাদের পক্ষ হ'তে ভাল ও মন্দ উভয়ই তুমি প্রত্যক্ষ করবে। আমি বললাম, অতঃপর এ কল্যাণের পর কি পুনরায় অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে। তা এই যে, জাহান্নামের দিকে কতক আহ্বানকারী হবে, যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদেরকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের মতই হবে এবং

আমাদের কথার ন্যায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, আমি সে অবস্থায় উপনীত হ'লে আমাকে কি নির্দেশ দেন? (আমার করণীয় কি হবে)? তিনি বললেন, তখন অবশ্যই মুসলমানদের জামা'আত (সংগঠন) ও মুসলমানদের ইমামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোন মুসলিম সংগঠন ও মুসলিম ইমাম না থাকে (তখন আমাদের করণীয় কি)? তিনি বললেন, বৃক্ষমূলকে ধারণ করে হ'লেও সেসব (কুফরী) দলকে পরিত্যাগ করে চলবে। এমনকি এ অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যাবে, অথচ তুমি ঐ অবস্থায়ই থাকবে (অর্থাৎ বাতিল ফিরকা থেকে বিরত থেকে দৃঢ়ভাবে হক ধারণ করে থাকবে) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৮২)*।

বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সতর্কবাণীর ন্যায় মহানবী (ছাঃ)-এর সতর্কবাণীরও যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, উপরের আলোচনায় তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আল্লাহ্‌র সতর্কবাণীকে প্রত্যক্ষ ঘোষণা এবং মহানবী (ছাঃ)-এর সতর্কবাণীকে পরোক্ষ ঘোষণা বলা যেতে পারে। তবে উভয় সতর্কবাণীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। অতএব আমরা সর্বান্তকরণে এক আল্লাহ্‌র আদেশ ও তার বাস্তবায়নকারী মহানবী (ছাঃ)-এর বাণীর সমন্বয়ে আমাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা সুস্থির করব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্‌সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্‌র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতের ও ভাগ্যের রেজিষ্ট্রার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুলোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আল্‌ফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি :

মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১. ঐ রাতে বান্দাহ্‌র গুনাহ্‌ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভাল-মন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২. ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...! এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপ: ১. সূরায়ে দুখান-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ-

অর্থ: (৩) আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'। হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা এটা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ-

অর্থ: 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫২-৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ.. 'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন' *(মুসলিম হা/৬৬৯০)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)। এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে 'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ:

১. আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا الخ- 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী, আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে 'যঈফ'।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২. মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'। এই হাদীছটিতে 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত' নামক একজন রাবী আছেন, যার সনদ 'মুনক্বাত্বা' হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, 'নিছফে শা'বান'-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩. ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন, 'না'। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন'।

জমহূর বিদ্বানগণের মতে ‘সিরার’ অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা‘বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা‘বানের শেষের ছিয়াম দু’টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

শবেবরাতের ছালাত :

এই রাত্রির ১০০ শত রাক‘আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা ‘মওযূ’ বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিস্কৃত হয়। যেমন মিশকাতুল মাছাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) ‘আল-লাআলী’ কেতাবের বরাতে বলেন, ‘জুম‘আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে ‘ছালাতে আল্ফিয়াহ’ নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এই বিদ‘আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ‘আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন’।

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা‘আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যপ্তি লাভ করে।

রূহের আগমন :

এই রাত্রিতে ‘বাক্বী‘এ গারক্বাদ’ নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯)* যে যঈফ ও মুনক্বাত্বা‘ তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ’লঃ এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ’তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ’লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর-এর ৪ ও ৫নং আয়াত দু’টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে,

تَنَزَّلُ الْمَلآئِكَةُ وَالرَّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ-

‘সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত’। এখানে ‘সে রাত্রি’ বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় ‘রূহ’ অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। ‘রূহ’ শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, ‘এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

শা‘বান মাসের করণীয় :

রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা‘বান মাসের প্রধান করণীয় হ’ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা‘বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন’। যারা শা‘বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা‘বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা ‘আইয়ামে বীয’-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা‘বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ’লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ‘আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

(২য় কিস্তি)

ইসলামের দৃষ্টিকোণে মানবাধিকারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

'মানবাধিকার' (Human Rights) শব্দটি আধুনিক জগতে অতি পরিচিত ও ব্যবহারগত একটি শব্দ হিসাবে স্থান করে নিলেও এর মৌলিক ধারণা ও ব্যবহার কিন্তু বহু প্রাচীন। বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে জানা যায় পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য কি? কেউ কেউ বলেছেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল ১,৬০০ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ এটা পৃথিবী সৃষ্টির ৪৬০ কোটি বছর আগে। এতে প্রাণের উদ্ভব ঘটে সম্ভবত ৩৫০ কোটি বছর আগে। আর মানুষ এসেছে ১ লক্ষ বছর আগে।[৭৫] কারও মতে, পৃথিবীতে মানুষের আগমন কয়েক লক্ষ বছর পূর্বে। কেউ বলেন, আদম (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়কালের ব্যবধান মোটামুটি ভাবে ঊনিশ শত বছর। অধুনা হিসাব করে দেখা গেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) খৃষ্টপূর্ব ১৮৫০ সালের দিকে জীবিত ছিলেন। প্রাপ্ত এই হিসাবের সাথে বাইবেলের হিসাব যোগ করে নিলে দেখা যায়, দুনিয়াতে প্রথম মানুষ (আদম আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল খৃষ্টপূর্ব মাত্র ৩৮ শত বছর আগে।[৭৬] ইসলামী পণ্ডিতগণ এই সময়কালকে অধিক যুক্তিসঙ্গত কাল হিসাবে ধরে নিয়েছেন। যদি তাই-ই হয় তাহ'লে এ বিশ্বজগতের সৌভাগ্যবান ও বিরাট দেহাবয়বের অধিকারী যাঁর উচ্চতা ছিল ৬০ হাত[৭৭] আদম (আঃ)-এর সময়কালে অথবা তৎপরবর্তীতে মানবাধিকারের কোন ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কি-না। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন দুনিয়াতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁর পরে নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ) প্রমুখ থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটেছিল। এরকম ৩১৫ জন রাসূল সহ ১ লক্ষ ২৪ হাযার[৭৮] পয়গম্বর ধরাধামে প্রেরিত হন মানবতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। যার পরিপূর্ণ ইতিহাস ও ঘটনা কুরআন ও হাদীছ বিশ্লেষণ করলে জানা যায়। যেমন- কুরবানী কবুল হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শয়তানের প্ররোচনায় কাবিল তার সহোদর ভাই হাবিলকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। পরে কাবিল তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল। কিন্তু অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য পৃথিবীতে সংঘটিত অন্যায় হত্যাকাণ্ডের পাপের একটা অংশ তার উপর বর্তাবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অন্যায়ভাবে কোন মানুষ নিহত হ'লে তাকে খুন করার পাপের একটা অংশ আদম (আঃ)-এর প্রথম পুত্র কাবিলের আমলনামায় যুক্ত হয়। কেননা সেই প্রথম হত্যার সূচনা করে'।[৭৯] তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান হানি বা অন্য কোন প্রকারের যুলুম করেছে, সে যেন তার থেকে আজই তা মিটিয়ে নেয়। সেই দিন আসার আগে যেদিন তার নিকটে দীনার ও দিরহাম (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) কিছুই থাকবে না। যদি তার নিকটে কোন সৎকর্ম থাকে, তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি কোন নেকী না থাকে, তাহ'লে মযলূমের পাপ সমূহ নিয়ে যালিমের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।[৮০]

উক্ত মর্মে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَـــرُوْنَ 'আর তারা অবশ্যই নিজের পাপ ভার বহন করবে ও তার সাথে অন্যদের পাপ ভার এবং তারা যেসব মিথ্যারোপ করে, সে সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে' *(আনকাবূত ২৯/১৩)*। অতএব অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা জঘন্য অপরাধ বা পাপ, যা মানব সৃষ্টির প্রথম দিকের কাহিনী থেকেই বুঝা যায়। সম্ভবত অপরাধের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থার জন্য আইন আদালত এরই ধারাবাহিকতা ছাড়া কিছুই নয়। আধুনিক মানবাধিকারের উৎপত্তি ও ধারণা এভাবেই এসেছে সন্দেহ নেই। কেননা মানুষ শিখেছে যে কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে, কেউ কারও উপর যুলুম করলে বা অত্যাচার করলে তার জন্য নিজেকে যেমন পরকালে চূড়ান্ত জবাবদিহি করতে হয়, অনুরূপে ইহকালেও তার কৃতকর্মের দরুণ শাস্তি ও জবাবদিহিতার চরম ব্যবস্থা রয়েছে এবং তা কেবল একটি পদ্ধতি মোতাবেক প্রয়োগ করা হয়।

এদিকে দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনার সকল জ্ঞান আদমকে দেওয়া হয়েছিল এবং তার মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম ভূমি আবাদ ও চাকা চালিত পরিবহণের সূচনা হয়। আর সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সেবার জন্য। আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্‌র দাসত্বের জন্য।[৮১] অন্য এক ঘটনায় বিধৃত হয়েছে 'কওমের অবিশ্বাসী নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল, এর মধ্যে অন্যতম একটি হ'ল আপনার অনুসারী হ'ল আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও গরীব, তাও আবার কম বুদ্ধি সম্পন্ন, আর আমাদের ওপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখছি

৭৫. অমল দাশ গুপ্ত, মানুষের ঠিকানা, ১৩ ও ১৪ পৃঃ।
৭৬. ডঃ মরিস বুকাইলি, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, রূপান্তর আখতার উল আলম, (ঢাকা : জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৬), ১২০-১২১ পৃঃ।
৭৭. মিশকাত, হা/৫৩৩৬।
৭৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ১ম খণ্ড (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০), পৃঃ ৯।
৭৯. বুখারী হা/৩৩৩৫; মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১১ 'ইলম' অধ্যায়।
৮০. বুখারী, হা/২৪৪৯; মিশকাত 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, যুলুম অনুচ্ছেদ, পৃঃ ২১।
৮১. নবীদের কাহিনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০।

না, তাদের এই আপত্তির জবাবে নূহ (আঃ) বলেন, وَيَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَـكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُوْنَ، وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِيْ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ–

‘আমি কোন (গরীব) ঈমানদার ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার দীদার লাভে ধন্য হবে। বরং আমি তোমাদের মূর্খ দেখছি। হে আমার কওম! আমি যদি ঐসব লোকদের তাড়িয়ে দেই, তাহ’লে কে আমাকে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রক্ষা করবে? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(হূদ ১১/২৯-৩০; শো‘আরা ২৬/১১১-১১৫)*।

উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহ গরীব-ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি; বরং তাদের (দ্বীনী গরীব-মিসকীন)-কে অনেক মর্যাদা দিয়েছেন, যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাযার বছর পূর্বে নূহ (আঃ) মারফত ঘোষিত হয়েছে। বর্তমান জগতের রাজা-বাদশাহ ধনী-গরীব, উচু-নিচু বলে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই(?) বলে যে আওয়াজ তোলা হয়, তা এরই অতি প্রাচীনতম ঐতিহাসিক দলীল বলে স্বীকৃত। খৃষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিশরের তৎকালীন সম্রাট ফেরাউন যখন আদেশ দিলেন, কোন ইহুদী পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই যেন হত্যা করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ফেরাউন ও তার মন্ত্রীরা সারা দেশে একদল ধাত্রী মহিলা ও ছুরিধারী জল্লাদ নিয়োগ করে। মহিলারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বনু ইসরাঈলের গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা করত এবং প্রসবের দিন হাজির হয়ে দেখত, ছেলে না মেয়ে। ছেলে হ’লে পুরুষ জল্লাদকে খবর দিত। সে এসে ছুরি দিয়ে মায়ের সামনে সন্তানকে যবেহ করে ফেলে রেখে চলে যেত।[৮২] এভাবে বনু ইসরাঈলের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে যেত। এ ঘটনাটি মূসার পূর্ব শিশু অবস্থায়। অতঃপর মূসা (আঃ) বড় হ’লে স্বৈরাচারী শাসক ফেরাউনের এসব লোমহর্ষক হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়নের প্রতিবাদে দীপ্তকণ্ঠে বললেন, لاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى– إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى– ‘বনু ইসরাঈলদের উপরে নিপীড়ন করো না। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় তার উপরে আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসে’ *(ত্ব-হা ২০/৪৭-৪৮)*। এখান থেকে বুঝা যায় যে, সে সময়ের মানবতা বিরোধী অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হয়েছিল।

এর পরই দেখা যায় ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে ধরে রাখার জন্য পিতা আযরের আদেশ অমান্য করলে পিতা বললেন, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি আমার সম্মুখ হ’তে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাও’ *(মারিয়াম ১৯/৪৬)*।

পিতার এই কঠোর ধমকি শুনে ইবরাহীম (আঃ) বললেন, قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ إِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّيْ عَسَى أَلَّا أَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ شَقِيًّا– ‘তোমার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চিয়ই তিনি আমার প্রতি মেহেরবান’ *(মারিয়াম ১৯/৪৭-৪৮)*। এখানে পিতা-মাতাকে যে সম্মান ও মানবতা দেখানো হয়েছে তা সুস্পষ্ট। এছাড়া পিতার সহযোগিতায় মুশরিকরা তাওহীদপন্থী ইবরাহীমের উপর অমানবিক অত্যাচার-নিপীড়ন, নিষ্ঠুর আচরণ, আগুনে নিক্ষেপ করার মত লোমহর্ষক ঘটনা ঘটালেও তিনি পিতার প্রতি অভিশাপ দেননি বরং আল্লাহ্‌র দরবারে খালেছ অন্তরে তার জন্য দো‘আ করেছেন। পিতা-মাতার প্রতি এমন মানবতা প্রদর্শনের নবী আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যুগে যুগে নবীগণ রেখে গেছেন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত। তবে সবশেষে শেষ ও বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) শুধু ঐ সময়ের বর্বর নিষ্ঠুর মানুষের জন্য নয় সর্বযুগে সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, যা ৬৩১ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক আরাফাহ ময়দানে দশম হিজরীতে প্রদত্ত বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে উল্লেখ রয়েছে। ৮ম হিজরীতে ১ লক্ষ ৪০ অথবা ৪৪ হাযার লোকের[৮৩] সম্মুখে রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষণ বিশ্ব মানবতা তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল মানুষের কাছে এটা মহাকালের মহাসনদ হিসাবে স্বীকৃত।

‘বিদায় হজ্জে’র ভাষণে বিশ্বনবী (ছাঃ) মানবাধিকার সম্পর্কিত যে সনদপত্র ঘোষণা করেন, দুনিয়ার ইতিহাসে তা আজও অতুলনীয়। সেদিন তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। (১) হে বন্ধুগণ! স্মরণ রেখ, আজকের এদিন, এ মাস এবং এ পবিত্র নগরী তোমাদের নিকট যেমন পবিত্র, তেমনি পবিত্র তোমাদের সকলের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ, রক্ত এবং তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের পরস্পরের নিকট পবিত্র। কখনও কারো উপরে অন্যায় হস্তক্ষেপ করবে না (২) মনে রেখ, স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও স্ত্রীদের তেমন অধিকার আছে (৩) সাবধান! শ্রমিকের ঘাম শুকাবার

৮২. তাফসীর ইবনে কাছীর, কাছাছ ৮৯; নবীদের কাহিনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬।

৮৩. ছফিউর রহমান মোবারকপুরী (রঃ), আর-রাহীকুল মাখ্‌তূম, পৃঃ ৫২২।

পূর্বেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দিবে (৪) মনে রেখ যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে প্রকৃত মুসলমান হ'তে পারে না (৫) দাস-দাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর হইও না। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তাই খেতে দিবে; তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকে তাই (সমমূল্যের) পরিধান করতে দিবে (৬) কোন অবস্থাতে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না।[৮৪]

এমনিভাবে সেদিন তিনি মানবাধিকার সম্পর্কিত অসংখ্য বাণী বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে পেশ করেন। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর নবুঅতের ২৩ বছরের জীবনে আরবের একটি অসভ্য ও বর্বর জাতিকে সভ্য ও সুশৃংখল জাতিতে পরিণত করেছিলেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার সাধিত হয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলে দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, 'অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের এবং শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন পার্থক্য নেই। বরং তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে অধিক মুত্তাক্বী'।[৮৫] অর্থনৈতিকক্ষেত্রে তিনি সূদকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেন এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে এমন একটি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক তাদের আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর কোন মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। বিশ্বনবী (ছাঃ) নারী জাতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ঘোষণা করলেন 'মায়ের পায়ের নিকটে সন্তানের জান্নাত'।[৮৬] নারী জাতিকে শুধু মাতৃত্বের মর্যাদাই দেননি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকারকে করেছেন সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, যা অন্য কোন ধর্মে দেখা যায় না। কৃতদাস আযাদ করাকে তিনি উত্তম ইবাদত বলে ঘোষণা করেন।[৮৭] ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেখানে মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা এবং বিভিন্ন বস্তুর পূজা আরববাসীদের জীবনকে কলুষিত করেছিল সেখানে তিনি আল্লাহ্র একত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মোদ্দাকথা তিনি এমন একটি অপরাধমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে কোন হানাহানি, রাহাজানি, বিশৃংখলা শোষণ, যুলুম, অবিচার- ব্যভিচার, সূদ-ঘুষ ইত্যাদি ছিল না।

বিশ্ব নবী (ছাঃ)-এর জীবনী লিখতে গিয়ে খৃষ্টান লেখক ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর বলেছেন, 'He was the matter mind not only his own age but of all ages' অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাকে শুধু সে যুগেরই একজন মনীষী বলা হবে না বরং তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।[৮৮] শুধুমাত্র ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূরই নন, পৃথিবীর বুকে যত মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে প্রায় প্রত্যেকেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে তাঁদের অমূল্য বাণী পৃথিবীর বুকে রেখে গেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُــو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْــرًا. 'তোমাদের জন্য আল্লার রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপস্থাপন করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেবল একজন ধর্মীয় নেতাই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক ও মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠাতা। যেমনটি মুহাম্মাদ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় এসে সমাজ সংস্কার করতঃ রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। তখন তিনি পৌত্তলিক, ইহুদী, নাছারা সহ সকল ধর্মের লোকের সমর্থন নিয়ে একটি ঐতিহাসিক সনদ রচনা করেন। যা 'মদীনা সনদ' বলে খ্যাত। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম লিখিত সংবিধান বা শাসনতন্ত্র।[১৫] উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার, জান, মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়। এই সংবিধানে বিধর্মী ও সংখ্যালঘুদের সাথে কিরূপ আচার-ব্যবহার করবে তার সুস্পষ্ট ও উত্তম নির্দেশনা দেয়া আছে। সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছে। কেউ কারও উপর জবরদস্তি করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এ কথা বিশ্ববাসীর নিকট চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা যায় যে, সকল মানবাধিকারের উৎস, উত্তম প্রয়োগ ব্যবস্থা ও সংরক্ষণকারী সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হ'ল কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ।

[চলবে]

---

৮৪. তদেব, পৃঃ ২০।
৮৫. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২৯৬৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০।
৮৬. মিশকাত হা/৪৯৩৯।
৮৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫।
৮৮. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী, পৃঃ ২০।
১৫. তদেব, পৃঃ ২০।

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ ভেঙ্গে দিচ্ছে ভারত

আহমদ সালাহউদ্দীন

বাংলাদেশের পশ্চিমে সুন্দরবন সংলগ্ন তালপট্টি দ্বীপটি সুকৌশলে ভারত ভেঙ্গে দিচ্ছে। বাংলাদেশের সীমানায় বৃহৎ এ দ্বীপটি যাতে আর গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য ভারত উজানে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর স্রোত ও পলি নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে নতুন করে পলি জমতে না পেরে তালপট্টি দ্বীপ আর উঁচু না হয়ে বরং সম্প্রতি সেখানে ভাঙন শুরু হয়েছে। ওদিকে চার-পাঁচ বছর আগে থেকে ভারত বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু করেছে যে, তালপট্টি দ্বীপটি বিলীন হয়ে গেছে। এর কোন অস্তিত্ব বর্তমানে আর নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তালপট্টি দ্বীপের অস্তিত্ব এখনো আছে এবং ভাটার সময়ে এর চূড়া সামান্য ভেসে ওঠে। কিন্তু জোয়ারে পুরোপুরি ডুবে যায়। আগে যত দ্রুত দ্বীপটি গড়ে উঠছিল, বর্তমানে সেভাবে আর গড়ছে না। তবে বিলীন হয়নি। গত সপ্তাহেও গুগলের স্যাটেলাইট মানচিত্রে তালপট্টি দ্বীপটির অস্তিত্ব দেখা গেছে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সমুদ্র বিজ্ঞান ও ভূগোল বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আব্দুর রব এসব তথ্য জানিয়ে বলেন, দ্বীপটি রেকর্ডপত্রে বাংলাদেশের। একাত্তরের স্বাধীনতার পর থেকে ভারত জোরপূর্বক তালপট্টি দখল করে রেখেছে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একবার দ্বীপটির দখল নিয়েছিলেন। এরপর ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা না হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বিরোধপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশের নৌবাহিনীকে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গাড়তে দেয়নি। এর মধ্যে ভারত একাধিকবার জরিপ করে দেখেছে, তালপট্টি পুরোপুরি জেগে উঠলে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সমুদ্রসীমার ফায়ছালা হ'লে তারা কখনোই এর মালিকানা পাবে না। বরং বাংলাদেশ এর মালিকানা লাভ করলে সমুদ্রসীমায় অনেকদূর এগিয়ে যাবে। তাই ভারত তালপট্টি দ্বীপটি ভেঙ্গে দেয়ার কৌশল গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা নিয়ে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের বিরোধের ব্যাপারে সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের (ইটলস) রায়ের পর ভারত এ ব্যাপারে আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। যাতে তালপট্টির মালিকানা কোনভাবেই বাংলাদেশ না পেতে পারে এজন্য একদিকে হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় ভারতীয় অংশে গ্রোয়েন নির্মাণ করে স্রোতের গতি বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, অপরদিকে নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ করে পলি ভিন্ন খাতে সরিয়ে দিচ্ছে।

এ অবস্থায় মিয়ানমারের পর এবার ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে যদিও বাংলাদেশ প্রচণ্ড আশাবাদী হয়ে উঠেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আশায় গুড়েবালি পড়তে পারে বলেই আশংকা করা হচ্ছে। এদিকে সরকারের মেরিটাইম বিশেষজ্ঞ ও সমুদ্র অঞ্চল সীমানা রক্ষা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট মহল এবং উপকূলবর্তী সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের স্বপ্ন, আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, সেন্টমার্টিনের মতো তালপট্টি দ্বীপও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বৃদ্ধিতে হয়তো বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তাদের দাবি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে আইনী লড়াইয়ে জোরালোভাবে তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি উপস্থাপন করে দক্ষিণ তালপট্টিসহ বিশাল সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত করা হোক। দক্ষিণ তালপট্টি দখল করে নেয়ার পক্ষে কোন যৌক্তিক বা আইনগত দাবি নেই ভারতের। তারা যে এটি জবর দখল করে রেখেছে দীর্ঘদিন, তার বিপরীতে জোরালো কোন পদক্ষেপও নেয়া হয়নি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। দক্ষিণ তালপট্টি বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের বলে প্রমাণিত হ'লেও ভারত গায়ের জোরে বরাবরই তা অস্বীকার করে আসছিল। এখন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের রায়ে এটা ফেরতের পথ সুগম হওয়ার আগেই ভারত চালাকি করে দ্বীপটি ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে।

নৌবাহিনী সূত্রে জানা যায়, বঙ্গোপসাগরের অগভীর সামুদ্রিক এলাকায় জেগে ওঠা উপকূলীয় দ্বীপ দক্ষিণ তালপট্টি। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা যেলার শ্যামনগর এবং পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা যেলা বসিরহাটের মধ্যস্থল হাড়িয়াভাঙ্গা নদী দ্বারা চিহ্নিত সীমান্ত রেখা বরাবর হাড়িয়াভাঙ্গার মোহনার বাংলাদেশ অংশে অগভীর সমুদ্রে দ্বীপটির অবস্থান। দ্বীপটি গঙ্গা বা পদ্মা নদীর বিভিন্ন শাখা নদীর পলল অবক্ষেপণের ফলে গড়ে উঠেছে। হাড়িয়াভাঙ্গা মোহনা থেকে দ্বীপটির দূরত্ব মাত্র ২ কিলোমিটার। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের সরাসরি উত্তরে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড এবং সর্ব-দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দ্বীপটির বর্তমান আয়তন প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপাঞ্চলের দক্ষিণভাগে আঘাত হানার পর পরই দ্বীপটি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রথম দৃষ্টিগোচরে আসে। তৎকালীন খুলনা যেলা প্রশাসন নৌবাহিনীর সহযোগিতায় প্রাথমিক জরিপ শেষে প্রশাসনিক দলিলপত্রে নথিভুক্ত করে দ্বীপটির নামকরণ করে দক্ষিণ তালপট্টি। ভারত তখন এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। অথচ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বীপটি 'নিউমুর দ্বীপ' নামে অবহিত করে রাতারাতি দখল করে নেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের অস্থির সময়ে দ্বীপটির দখলদারিত্ব তখন আর বাংলাদেশ বা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। পরে ১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইআরটিএস ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে স্বল্প ও গভীর সামুদ্রিক পানিতে জেগে ওঠা এই ডুবন্ত ভূখণ্ডের জরিপ করা হয় এবং দ্বীপটি বাংলাদেশ অংশে বলে প্রমাণিত হওয়ায় রেকর্ডভুক্ত করা হয়। এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে হৈ চৈ হ'তে থাকে। কিন্তু প্রতিবাদ জোরালো না হওয়ায় দীর্ঘসময় ধরে দ্বীপটি ভারতের অবৈধ দখলে রয়ে গেছে। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের চারপাশ দশ কিলোমিটার বিস্তৃত। এখানে উপকূলীয় সমুদ্রের গড় গভীরতা মাত্র ৩ থেকে সাড়ে ৫ মিটার। দ্বীপটি থেকে সোজা প্রায় ৪৩ কিলোমিটার দক্ষিণে গভীর সামুদ্রিক খাত বা অতলান্তিক ঘূর্ণাবর্তের (সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড) অবস্থান। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী দ্বীপটি ও এর চার পাশের ভূরূপতাত্ত্বিক অবস্থা এবং সংলগ্ন হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল

নদী দু'টির জলতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া থেকে ধারণা করা হয়, অদূর ভবিষ্যতে এটি উত্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড তালপট্টির সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। দেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর মংলা ও সংশ্লিষ্ট মেরিটাইম বিশেষজ্ঞ এবং সমুদ্র সম্পদ পর্যবেক্ষকদের অভিমত, আয়তনের দিক থেকে দক্ষিণ তালপট্টি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ হ'লেও ভূ-রাজনৈতিক নিরিখে দ্বীপটির গুরুত্ব অপরিসীম। উপকূলীয় দ্বীপটির মালিকানার সাথে জড়িত রয়েছে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের বিশাল সমুদ্রাঞ্চলের সার্বভৌমত্বের স্বার্থ। তাই সালিশি নিষ্পত্তির মাধ্যমে শুধু দক্ষিণ তালপট্টি নয়, সমুদ্রসীমার এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনকে নিষ্কণ্টক করা একান্ত যরূরী। বাংলাদেশের উপকূল থেকে দক্ষিণে প্রায় ৫শ' কিলোমিটার পর্যন্ত মহীসোপানের বিস্তৃতি। এই অগভীর সমুদ্রাঞ্চলের মোট আয়তন কমপক্ষে সাড়ে ৩ লাখ বর্গমাইল। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের সর্বশেষ নীতি অনুযায়ী নিজ দেশের উপকূলীয় সংলগ্ন মহীসোপানের যাবতীয় সমুদ্র সম্পদরাজির ব্যবহার ও মালিকানা স্বত্ব ভোগ করার একচ্ছত্র অধিকার সে দেশের রয়েছে। দক্ষিণ তালপট্টি মালিকানার সাথে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের স্বাভাবিক সীমার অতিরিক্ত কমপক্ষে ২৫ হাযার বর্গামইল সমুদ্রাঞ্চলের স্বার্থ জড়িত। দ্বীপটির দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে হাযার হাযার বর্গকিলোমিটার সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে মৎস্য ও তেল-গ্যাস ক্ষেত্রসহ বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক সম্পদ রয়েছে। ঐ এলাকার সমুদ্রতলে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, এ্যালুমিনিয়াম, তেজস্ক্রীয় ভারী খনিজ পদার্থ ইত্যাদির বিপুল সঞ্চয় রয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে বঙ্গোপসাগরের অগভীর মহীসোপান তলদেশে খনিজ তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বড় ধরনের সঞ্চয় আবিস্কৃত হওয়ায়। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের ঐ সামুদ্রিক এলাকায় অর্থনৈতিক মৎস্য অঞ্চল গঠিত। এটি ৩টি ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের কাছে সাউথ প্যাসেজ, দ্বিতীয়টি বরগুনা-পটুয়াখালীর কাছে মিডল প্যাসেজ এবং খুলনা-সাতক্ষীরা ও সুন্দরবনের কাছে ইস্ট প্যাসেজ। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের কোলে অবস্থিত মূল সুন্দরবন। ভারতের ২৪ পরগনার দক্ষিণ ভাগও সুন্দরবনের অংশবিশেষ। পশ্চিমে ভাগীরথি নদীর মোহনা থেকে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সুন্দরবন বিস্তৃত। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, ৬ হাযার ১৭ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত সুন্দরবনের ৪ হাযার ১৪৩ বর্গকিলোমিটার ভূ-ভাগ আর ১ হাযার ৮৭৪ বর্গমিলোমিটার জলভাগ। বর্তমানে সুন্দরবন ঘিরে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অংশে বিভিন্নভাবে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চলছে। সমুদ্র অঞ্চল সীমানা রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ নুর মোহাম্মদ এক সাক্ষাৎকারে জানান, দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে নির্ধারণ হয়েছে। তাতে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি যাই থাক, একটি দীর্ঘ বিতর্কের অবসান হয়েছে। তবে এখানে কোন ভুল বা অপাপ্তি থাকলে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে ভারতীয়দের সাথে আরো কার্যকরভাবে আন্তর্জাতিক আদালতে লড়তে হবে। এ অবস্থায় বঙ্গোপসাগরে শুধু মালিকানা প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, এর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণও নিতে হবে বাংলাদেশকে। তিনি বলেন, কমিটির সদস্য সচিব অবসরপ্রাপ্ত রিয়াল এ্যাডমিরাল খোরশেদ আলমসহ নেতৃবৃন্দ ১৯৮২ সালে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন পাস হওয়ার পর থেকে বহু দেন দরবার করেছে বিভিন্ন পন্থায়। এখন ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ ও বিরোধ নিস্পত্তি হওয়া যরূরী। এক্ষেত্রে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপসহ ঐ এলাকার বিরাট সমুদ্রাঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার মতে, আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে ভারতের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই জোরদার করতে হবে। এজন্য দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপে প্রয়োজনে যৌথভাবে বা আন্তর্জাতিকভাবে জরিপের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভারতীয়রা কোন কৌশলে দ্বীপটি ভেঙ্গে দেওয়ার অপচেষ্টা করলে সেটাও আন্তর্জাতিক আদালতের নযরে আনতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ ঢাকঢাক গুড়গুড় করার সুযোগ নেই। এখনই কঠোর না হ'লে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে।

বিজিবি সূত্র জানায়, দক্ষিণ-পশ্চিমসহ দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় হাযার হাযার বিঘা জমি ভারত জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। যা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে জরিপ ও বৈঠক চলছে, কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। ভারত দ্বিপাক্ষিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কথা বলে কালক্ষেপণ করে চলেছে। কাগজপত্র ও রেকর্ডে জমি বাংলাদেশের থাকলেও ভারতীয়রা যুক্তির পরিবর্তে গায়ের জোরে সব ভোগদখল করছে। একইভাবে সমুদ্রাঞ্চলে তালপট্টিসহ বিরাট এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে আছে ভারত। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের অভিমত, প্রতিবেশীদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধাবোধের নমুনা পাওয়া যায় না। প্রতিবেশীকে বরাবরই কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও কব্জার মধ্যে রাখতে তারা আগ্রহী। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি গায়ের জোরে দখল করে নেয়া তার বড় প্রমাণ। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিষয়টির নিস্পত্তির ব্যাপারে রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন, সচেতন ও পর্যবেক্ষক মহল জোর দাবী তুলেছেন। সমুদ্র অঞ্চল সীমানা রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ নূর মোহাম্মদ আরো জানান, অনতিবিলম্বে সরকারকে একটি সমুদ্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার আওতায় থাকবে একটি সমুদ্র অধিদপ্তর। একইসাথে আন্তর্জাতিক সমুদ্র গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। যেভাবেই হোক বিশাল সমুদ্র সম্পদকে সুরক্ষা করতে হবে। কারণ বাংলাদেশের স্থলভাগের চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ রয়েছে সমুদ্রে। এই বঙ্গোপসাগরে যেসব নদীর প্রাকৃতিক গতিপথ ও প্রবাহ ঐতিহাসিকভাবে যেভাবে এসে মিশেছে সেটাও অধিকভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ভারত যেন বাঁধ দিয়ে এই গতিপথ ও প্রবাহ পরিবর্তন করতে কিংবা ঘুরিয়ে দিতে না পারে, সে ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

[সংকলিত]

ভূমিকম্পের টাইম বোমার ওপর ঢাকা ॥ এখনই সচেতন হ'তে হবে

কামরুল হাসান দর্পণ

'একবার কল্পনা করুন তো, আপনার দেহের নিম্নাংশ ধসে পড়া দেয়ালের নিচে। থেঁতলে গেছে। কিছুতেই বের হ'তে পারছেন না। কোন রকমে বেঁচে আছেন। ঐ অবস্থায়ই আপনি সন্তানের বের হয়ে থাকা হাতটি দেখছেন'। এ চিত্র নিশ্চয়ই আপনার কল্পনায়ও ঠাঁই পাবে না। চিন্তাধারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবেন। আমরাও এ চিত্র কল্পনায় আনতে চাই না। অথচ এ ধরনের বা এর চেয়ে আরও ভয়াবহ চিত্র যে কোন সময়ই পত্রিকাজুড়ে দেখা যেতে পারে। এমন আশংকা লোকজন করছেন। ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা দিয়েছেন, ঢাকা শহর 'ভূমিকম্পের টাইম বোমা'র উপর বসে আছে। যে কোন মুহূর্তে ফাটতে পারে। ফাটলে কী হবে, তারই একটি কাল্পনিক দৃশ্য লেখার শুরুতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দৃশ্য পত্রিকাজুড়ে প্রকাশিত হাযারো করুণ চিত্রের একটি হ'তে পারে, যা হৃদয়কে দলিত-মথিত করে তুলবে। ভাষাহীন, স্থবির হয়ে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। প্রাকৃতিক এই মহাদুর্যোগ থেকে আগাম রেহাই পাওয়ার জন্য এমন কোন যন্ত্র আজ পর্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি, যাতে প্রলয়ংকরী ঝড় বা মহাপ্লাবনের আশঙ্কা আগে থেকেই টের পাওয়া যায়। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে আগাম ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু ভূমিকম্প প্রকৃতির এমনই এক অভিশাপ, কখন আঘাত হানবে কারও পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। আঘাত হানার পর এর ধ্বংসলীলা দেখা যায়। কেবল তখনই মানুষ আহত-নিহতদের উদ্ধারের প্রস্তুতি নিতে পারে।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি কতটুকু? পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে যা জানা যায়, তার চিত্রটি হতাশাজনক। আমরা শুধু জানি, সরকার উদ্ধার কর্ম পরিচালনার জন্য ৭০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু উদ্যোগ বাস্তবায়ন হবে কবে এর নিশ্চয়তা নেই। অথচ 'ভূমিকম্পের টাইম বোমা'র উপর বসে থাকা ঢাকা শহরে যে কোন সময় ভূমিকম্প ভয়াবহ আঘাত হানতে পারে।

জাতিসংঘ প্রণীত 'আর্থকোয়েক ডিজাস্টার রিস্ক ইনডেক্সে'র এক বুলেটিনে দেখানো হয়েছে, বিশ্বের ২০টি ঝুঁকিপূর্ণ শহরের মধ্যে ইরানের রাজধানী তেহরান প্রথম ও আমাদের প্রিয় নগরী ঢাকা দ্বিতীয়। প্রকৃতিগতভাবে আমাদের ঢাকা শহরকে দুর্ভাগাই বলতে হবে। এর আগে দেখা গেছে, বিশ্বের সবচেয়ে বসবাস অনুপযোগী শহরের তালিকায়ও ঢাকা দ্বিতীয়। প্রথম জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারে। অর্থাৎ অপরিকল্পিতভাবে ঢাকাকে আমরা বসবাসের অনুপযোগী করে গড়ে তুলেছি। এই দায় আমাদের। আর প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের কবলে পড়ার ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও দায়ী। এক অসতর্ক, অচেতন ও অজ্ঞানতার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানলেই ঢাকা শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। মারা যেতে পারে ২ লাখ মানুষ। এই ২ লাখের মধ্যে আমি, আপনি, আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানও থাকতে পারে। এই যে আমি, আপনি যে ভবনটিতে বসবাস করছি, পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তা অত্যন্ত পুরনো বা দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি সূচকের তথ্যানুযায়ী, ঢাকা শহরের মাত্র ৩৫ ভাগ স্থাপনা শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে। আর বাকি ৬৫ ভাগ বালু দিয়ে বিভিন্ন জলাশয় ভরাট করে নরম মাটির উপর নির্মাণ করা হয়েছে। কী ভয়াবহ কথা! তার মানে এসব স্থাপনা যারা তৈরী করেছেন, তারাই আমাদের জন্য একেকটি 'মৃত্যুকূপ' তৈরী করে রেখেছেন। সরকারি তথ্যমতেই ৭২ হাযার ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। বেসরকারি তথ্যমতে এ সংখ্যা কয়েক লাখ। তাৎপর্যের বিষয়, ভূমিকম্প হ'লে আহতদের চিকিসার জন্য যে মেডিকেল হাসপাতালকে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে, সেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালই ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কাজেই ভূমিকম্প হ'লে সাধারণ মানুষ যে চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত হবেন, তা নিশ্চিত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হ'লে ঢাকার ৬০ ভাগ ভবন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাবে। পুরনো ঢাকাসহ অন্যান্য এলাকায় ভবন ধসে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হবে।

'ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' (ইউএনডিপি) এক গবেষণায় বলেছে, যে কোন সময় বাংলাদেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হ'তে পারে। অর্থাৎ ভূমিকম্পে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু যে কোন সময় হ'তে পারে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুই বছরব্যাপী (২০০৮-২০০৯) এক গবেষণায় আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, বড় ধরনের ভূমিকম্প হ'লে সেই এলাকার মাটির স্তর আলাদা হয়ে যায়। আলাদা এই মাটির স্তর শক্ত হ'তে ১০০ বছর লেগে যায়। মাটির স্তর শক্ত হয়ে গেলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঐ এলাকায় পুনরায় ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ১৭৬২ সালে সীতাকুণ্ডে ও ১৮৮৫ সালে মধুপুরের ভয়াবহ ভূমিকম্পের আলোকে তারা হিসাব করে দেখেছেন, এ বছরই বড় ধরনের ভূমিকম্প পুনরায় আঘাত হানতে পারে। এ হিসাবে ঢাকায় যে কোন মুহূর্তে ভূমিকম্প হ'তে পারে। তার আলামত ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। প্রায়ই ছোট মাত্রার ভূমিকম্প ঢাকা শহর কাঁপিয়ে দেয়। সর্বশেষ গত ১১ এপ্রিল ঢাকায় ৩.৮ মাত্রায় পরপর

দু'বার ভূমিকম্পে ঢাকা নড়ে উঠে। এ রকম ছোট মাত্রার ভূমিকম্প প্রতি বছরই একাধিকবার হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ছোট ছোট ভূমিকম্প বড় কিছু ঘটনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদি ১৮৮৫ সালের মতো ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়, তবে ঢাকা শহরের এক তৃতীয়াংশ ভবন ধ্বংস হবে। প্রাণ হারাবে লাখ লাখ মানুষ।

ঢাকায় যে এ বছর বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে, তা গবেষকরা হিসাব-নিকাশ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু শঙ্কাজনক এই পরিস্থিতি থেকে আমরা অন্তত নিজেদের কিভাবে নিরাপদে রাখতে পারি, আমরা কি তা নিয়ে ভাবছি? ভাবছি না। বিল্ডিং কোড না মেনে অপরিকল্পিতভাবে একের পর এক ভবন নির্মাণ করে চলেছি। ভূতত্ত্ববিদ ড. বদরুল ইমাম বলেছেন, আমাদের জন্য সবচেয়ে বিপদের কারণ ভরাট এলাকায় ভবন নির্মাণ করা। ঢাকা শহরের চারপাশের খাল, বিল, নদী ও জলাশয় ভরাট করে প্রতিনিয়ত ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ভরাট কাজ করা হচ্ছে বালু ও কাদামাটি দিয়ে। যা ভূমিকম্পের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি জানান, রাজধানীর পূর্বাঞ্চলে জলাভূমি ও নিচু এলাকা ভরাট করে বহুতল ভবন নির্মাণের ফলে ঢাকায় ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ঢাকায় ভূমিকম্পে ক্ষতির পরিমাণ হবে অনেক বেশী। ক্ষতির পরিমাণ বেশী হওয়ার জন্য জাতিসংঘের সমীক্ষায় ঢাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব, অধিক ভবন, অপরিকল্পিত অবকাঠামো, নগরে খোলা জায়গার অভাব, সরু গলিপথ ও লাইফ লাইনের দূরবস্থাকে দায়ী করা হয়েছে। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতা নিয়ে বাংলাদেশের প্রস্তুতি খুবই সামান্য। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ঢাকার হাসপাতালগুলোর অধিকাংশেরই বিশেষ প্রস্তুতি নেই। জাতিসংঘের এ সূচক আমাদের জন্য ভয়াবহ ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভূমিকম্পের পর উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে সরকার, বিভিন্ন উদ্ধারকারী সংস্থা ও হাসপাতালগুলোর বিশেষ কোন প্রস্তুতিই নেই। তার মানে ভূমিকম্পে লাখ লাখ মানুষ তো মারা যাবেই, যারা আহত হয়ে বেঁচে থাকবেন তাদেরও বাঁচার উপায় নেই। তাৎপর্যের বিষয়, ভূমিকম্প যখন আমাদের একটু নাড়িয়ে দিয়ে যায়, কেবল তখনই সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো নড়েচড়ে বসে। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী ভূমিকম্পের মতোই তাদের এই নড়াচড়া স্থায়ী হয়। তারপর বেমালুম ভুলে যায়। অথচ স্বল্প সময়ে ভূমিকম্পের যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও বিভীষিকা ভাবটা এমন আগে ভূমিকম্প হোক, তারপর দেখা যাবে। এ ধরনের চিন্তা আত্মঘাতী বলা যায়। ভূমিকম্প সম্পর্কে সবার আগে সরকারকে তৎপর হ'তে হবে। সকল অনিয়ম দূর করতে হবে। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কর্ম যাতে দ্রুত করা যায়, এজন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদী সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের পর এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে নিয়মিত মহড়ার আয়োজন করতে হবে। বিল্ডিং কোড মেনে যাতে ভবন নির্মিত হয়, এজন্য রাজউককে কঠোর নযরদারির ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা বিল্ডিং কোড মানেনি, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলোকে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিতে হবে। সভা, সেমিনার, মানববন্ধনের মতো কর্মসূচির পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাতে হবে। যারা বাড়ির মালিক তাদের বলতে হবে, নিজের বাড়িটি যাতে ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ বাড়ির চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশী। নিজের বাড়িতে নিজেই চাপা পড়তে পারেন। যারা নতুন বাড়ি করছেন, তারা যেন রাস্তার জন্য কিছু জায়গা ছেড়ে ভবন তৈরী করেন। যাতে ভূমিকম্প হ'লে উদ্ধারকারী গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সহজে চলাচল করতে পারে। পাড়া-মহল্লায় যেসব কল্যাণমূলক সোসাইটি গড়ে উঠেছে, সেগুলো ভূমিকম্প সম্পর্কে নিজ নিজ এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সভা-সেমিনারের আয়োজন করতে পারে। ভূমিকম্প যে কোন সময়ে হ'তে পারে। কারণ পুরো ঢাকা শহরই ভূমিকম্পের টাইম বোমার উপর বসে আছে। দেখা যাবে, বাড়ির কেউ বাইরে অবস্থান করছেন, ভূমিকম্পের পর গিয়ে দেখলেন বাড়ির ধ্বংসস্তূপে তারই পরিবারের লোকজন চাপা পড়ে গেছে। তিনি শুধু একা বেঁচে রয়েছেন। তখন হয়তো বিলাপের সুরে বলবেন, আমি কেন বেঁচে রইলাম। কাজেই এ ধরনের ট্র্যাজিক ঘটনার শিকার হওয়ার আগে আমাদের প্রত্যেককেই সচেতন হ'তে হবে। ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে আহতদের চিকিৎসা দেয়ার জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রত্যেকটি হাসপাতালকে আগাম প্রস্তুতি নিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রস্তুতি নেয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। আর ভূমিকম্প থেকে নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যক্তিগতভাবে কিছু ব্যবস্থা নেয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভূমিকম্পের সময় বাড়ির বা ফ্ল্যাটের দুই দেয়ালের সংযোগস্থল, শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নিতে হবে। যাতে অন্তত মাথা ও বুকে আঘাত না লাগে। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা বেঁচে থাকার জন্য শুকনো খাবার রেডি রাখা। ভূমিকম্প অনুভূত হ'লে গ্যাসের লাইন ও বিদ্যুতের লাইন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিতে হবে।

॥সংকলিত॥

[ভূমিকম্পের মত ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে সর্বাগ্রে আমাদেরকে তাকওয়াশীল জীবন-যাপন করতে হবে। বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ্‌র নিকট কায়মনো বাক্যে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ' (রূম ৪১)। অতএব সকল প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতি ও পাপাচার থেকে বিরত থাকুন। -সম্পাদক]

দিশারী

প্রতারণা হ'তে সাবধান থাকুন!

(১) সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে নামধারী কিছু রাজনৈতিক ধর্মনেতা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবিরতভাবে মিথ্যাচার করে চলেছেন। তারা হানাফীদেরকে আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার অপকৌশল নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছেন এবং লিফলেট ছেড়ে ও বই লিখে অপপ্রচার করছেন। তাদের সকলের ভাষা প্রায় একইরূপ। যেমন,

'ভারতবর্ষে মুসলমানদের দ্বারা বৃটিশ তাড়াও আন্দোলনের অগ্রনায়ক সৈয়দ আহমদ (রহঃ) বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর ১৮৪০ সালের দিকে আব্দুল হক বেনারসী নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে এই দলটির উদ্ভব ঘটে। তার শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তার কারণে মক্কা-মদীনার আলেমগণ তাকে হত্যার ফতোয়া দেন। এরাই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও জিহাদকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়। প্রথমে তারা নিজেদের ওহাবী অথবা মোহাম্মদী বলে পরিচয় দিত। এদেশের মানুষ তাদেরকে রাফাদানী বা লা-মাযহাবী বলেই জানে। বৃটিশ সরকারের পদলেহী এই রফাদানী বা লা-মাযহাবী দলটির নেতা পাঞ্জাব প্রদেশের মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালভী নামক ব্যক্তি পাঞ্জাব প্রদেশের ইংরেজ গভর্ণরের নিকট ১৮৮৬ সালে এই বলে দরখাস্ত করে যে, আমরা সর্বদা ইংরেজ সরকারের হিতাকাঙ্খী ও শুভাকাঙ্খী। আমাদের নাম ওহাবী বা লা-মাযহাবীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তার পরিবর্তে আহলেহাদীছ রাখা হৌক।

পাঞ্জাব প্রদেশের ইংরেজ সরকারের ৩.১২.১৮৮৬ইং তারিখের ১৭৫৮ নং স্মারকে বাটালভীকে তার দরখাস্ত মঞ্জুরীর খবর দেওয়া হয়। এই আহলেহাদীছরাই ভারতে এভাবেই ইংরেজদের দালালী করেছিল।

এরপর থেকে তারা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামায়াত বিশেষ করে হানাফীদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। খৃষ্টানদের অর্থে বেড়ে ওঠা এই গুমরাহ দলটি হানাফীদের মুশরিক বলতেও দ্বিধা করে না। তারা বলে হানাফীদের নামাজই হয় না'।

উপরের বিজ্ঞপ্তিটি সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দু'টি আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত। শুধু তাই নয়, এগুলি নিয়ে মেহেরপুর যেলা প্রশাসনের কাছে গিয়ে আহলেহাদীছের সভা-সমিতি বন্ধ করার জন্য গাংনীর স্থানীয় 'বেদয়াতী দমন কমিটি'-র পক্ষ হ'তে লিখিতভাবে দাবী জানানো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে গাংনী শহরে তারা 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার শীর্ষ শিরোনাম ছিল, 'হানাফীদের মধ্যে উত্তেজনা, ডঃ গালিবকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা'। তারা আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে জুম'আর ছালাতের পর গাংনী উপযেলা শহরে মিছিল বের করার জন্য হানাফী জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করে। যদিও তারা তাতে সফল হয়নি। বরং সেখানে নির্ধারিত দিনে ও নির্ধারিত সময়ে আমীরে জামা'আতের উপস্থিতিতে আহলেহাদীছের স্মরণকালের বৃহত্তম ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই এবং এই সম্মেলনের মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে সেখানকার শতাধিক ব্যক্তি 'আহলেহাদীছ' হয়ে গেছেন এবং এখনো হচ্ছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।* এক্ষণে **এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ :**

আহলেহাদীছ-এর পরিচয় : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী ব্যক্তিকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে শর্তহীনভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন। এটি ইসলামের আদিরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যা ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে এ যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিচালিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চল শর্ত নয়।

ছাহাবায়ে কেরাম হ'লেন জামা'আতে আহলেহাদীছের প্রথম সারির সম্মানিত দল। যাঁরা এ নামে অভিহিত হ'তেন। যেমন প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী আহলুল হাদীছ'।[৮৯]

'বড় পীর' বলে খ্যাত শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (মৃঃ ৫৬১ হিঃ) 'নাজী' ফের্কা হিসাবে আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বর্ণনা দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বিদ'আতীদের নিদর্শন হ'ল আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন নামে তাদের সম্বোধন করা। এগুলি সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় বিদ্বেষ ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নয়। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল 'আছহাবুল হাদীছ' বা আহলেহাদীছ।[৯০] স্পেনের বিখ্যাত মনীষী হিজরী পঞ্চম শতকের ইমাম ইবনু হযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) বলেন, আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধীদের বাতিলপন্থী বলেছি, তারা হলেন, (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল 'আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছে'।[৯১] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে

৮৯. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ পৃঃ ১২; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০।*

৯০. *আব্দুল কাদের জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসরী ছাপা, ১৩৪৬ হিঃ), ১/৯০ পৃঃ।*

৯১. *ইবনু হযম, কিতাবুল ফিছাল, বৈরূত: ১/৩৭১।*

আহলেহাদীছদের অবস্থান এমন মর্যাদাপূর্ণ, যেমন সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের অবস্থান'।[৯২]

ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-৭৬/১৭০৩-৬২খৃঃ) বলেন, চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপর সংঘবদ্ধ ছিল না'।[৯৩] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১হিঃ) বলেন, মাযহাবী তাক্বলীদের এই বিদ'আত আবিস্কৃত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় নিন্দিত ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে[৯৪] শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, আব্বাসীয় খলীফা হারূনুর রশীদের খেলাফতকালে (১৭০-৯৩/৭৮৬-৮০৯ খৃঃ) আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রধান বিচারপতি থাকার কারণে ইরাক, খোরাসান, মধ্য তুর্কিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতি ঘটে'।[৯৫] পরে হানাফীরা শাফেঈদের বিরুদ্ধে মোঙ্গলবীর হালাকু খাঁকে ডেকে আনলে ৬৫৬/১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়ে যায়।

এ সময়ের কিছু পূর্বে গযনীর সুলতান মোহাম্মাদ ঘোরীর তুর্কী গোলাম কুতুবুদ্দীন আইবক ও ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে ৬০২ হিঃ/১২০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হ'তে বাংলা পর্যন্ত সামরিক বিজয় সাধিত হয়। এঁরা ছিলেন নওমুসলিম তুর্কী হানাফী। যাতে মিশ্রণ ঘটেছিল তুর্কী, ঈরানী, আফগান, মোগল, পাঠান এবং স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ আক্বীদা ও রীতি-নীতি সহ অসংখ্য ভারতীয় কুসংস্কার। ছাহাবা, তাবেঈন এবং আরব বণিক ও মুহাদ্দিছগণের মাধ্যমে ইতিপূর্বে প্রচারিত বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে যার খুব সামান্যই মিল ছিল'। এ সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে খ্যাতনামা ভারতীয় হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১৮৪৮-৮৬ খৃঃ) বলেন, 'ফিক্বহ ব্যতীত লোকেরা কুরআন ও হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ...আহলেহাদীছগণকে তারা জানত না। কেউ কেউ 'মিশকাত' পড়লেও তা পড়ত বরকত হাছিলের জন্য, আমল করার জন্য নয়। তাহকীকী তরীকায় নয়। বরং তাকলীদী তরীকায় ফিক্বহের জ্ঞান হাছিল করাই ছিল তাদের লক্ষ্য'।[৯৬] সুলায়মান নাদভী (১৮৮৪-১৯৫৩) বলেন, 'তুর্কী বিজয়ী যারা ভারতে এসেছিলেন, দু'চারজন সেনা অফিসার ও কর্মকর্তা বাদে তাদের কেউই না ইসলামের প্রতিনিধি ছিলেন, না তাদের শাসন ইসলামী নীতির উপর পরিচালিত ছিল। এরা ছিলেন আরব বিজয়ীদের থেকে অনেক দূরে'।[৯৭]

তাই বলা চলে যে, মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর ভারত হয়ে তুর্কী-ঈরানী সাধক-দরবেশদের মাধ্যমে ও রাজশক্তির ছত্রছায়ায় পরবর্তীতে বাংলাদেশে যে ইসলাম প্রচারিত হয়, তা ইতিপূর্বে আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে বাংলাদেশে আগত প্রাথমিক যুগের মূল আরবীয় ইসলাম হ'তে বহুলাংশে পৃথক ছিল। ফলে হানাফী শাসক ও নবাগত মরমী ছূফীদের প্রভাবে বাংলাদেশের মুসলমানেরা ক্রমে হানাফী ও পীরপন্থী হয়ে পড়ে। তারা বহুবিধ কুসংস্কার এবং শিরক ও বিদ'আতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে এদেশের মূল শরীয়তী ইসলাম পরবর্তীতে লৌকিক ইসলামে পরিণত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ঘোড়াপীর, তেনাপীর, ঢেলাপীর প্রভৃতি অসংখ্য ভুয়া পীর বাংলার মুসলমানের পূজা পায়।[৯৮]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, হানাফী মাযহাবের ক্বিয়াসী ফৎওয়া সমূহ এবং ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহের নামে যেসব মাসআলা-মাসায়েল ও আইনসূত্র সমূহ লিখিত হয়েছে, সেগুলিকে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর দুই শিষ্যের দিকে সম্বন্ধিত করার ব্যাপারে একটি বর্ণনাও বিশুদ্ধ নয়'।[৯৯] তিনি 'আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায়-এর পার্থক্য' শিরোনামে তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্র মধ্যে *(১/১৪৭-৫২)* আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের দলীল গ্রহণের নীতিমালা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি মযহাবপন্থী মুক্বাল্লিদগণের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'তারা মনে করে যে, একটি মাসআলাতেও যদি তাদের অনুসরণীয় বিদ্বানের তাক্বলীদ হতে সে বেরিয়ে আসে, তাহলে হয়তবা সে মুসলিম মিল্লাত থেকেই খারিজ হয়ে যাবে। ঐ বিদ্বান যেন একজন নবী, যাকে তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে'।[১০০] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে, ঐ ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তির চাইতে, যে ব্যক্তি রাফ'উল ইয়াদায়েন করে না। কেননা রাফ'উল ইয়াদায়েনের হাদীছ সংখ্যায় অধিক এবং অধিকতর মযবুত'।[১০১] হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের বিশ্বস্ত ফিক্বহ গ্রন্থ হেদায়া, আল-ওয়াজীয প্রভৃতির অমার্জনীয় হাদীছবিরোধিতা সম্পর্কে আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী বলেন, এগুলি মওযূ বা জাল হাদীছ দ্বারা পরিপূর্ণ।[১০২] ইমাম ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃঃ ৭০২ হিঃ) চার মাযহাবে প্রচলিত ছহীহ হাদীছ বিরোধী ফৎওয়াসমূহের একটি বিরাট সংকলন তৈরী করেছিলেন। যার ভূমিকাতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, এই মাসআলাগুলিকে চার ইমামের দিকে সম্বন্ধ করা 'হারাম'।[১০৩] কারণ চার ইমামের প্রত্যেকে 'আহলেহাদীছ' ছিলেন এবং তারা প্রত্যেকে বলে গেছেন, যখন তোমরা ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব'।[১০৪] আহলেহাদীছগণ তাঁদের সেকথাই মেনে চলেন এবং তাদের সার্বিক জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

এক্ষণে লিফলেট-এর জবাব সমূহ :

৯২. *ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ, বৈরূত: ২/১৭৯।*
৯৩. *শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/১৫২-৫৩ 'চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বের ও পরের লোকদের অবস্থা' অনুচ্ছেদ।*
৯৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/২০৮।*
৯৫. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৪৬ 'ফক্বীহদের মাযহাবী মতভেদের কারণ সমূহ' অনুচ্ছেদ।*
৯৬. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, ডক্টরেট থিসিস (রাবি ১৯৯২; প্রকাশক, হা.ফা.বা. ১৯৯৬), পৃঃ ২৩০।*
৯৭. *প্রাগুক্ত।*
৯৮. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৩-০৫।*
৯৯. *শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/১৬০।*
১০০. *ঐ, তাফহীমাতে ইলাহিয়াহ ১/১৫১।*
১০১. *ঐ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ২/১০।*
১০২. *আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী, নাফে' কাবীর (জামে' ছগীর-এর ভূমিকা, লাক্ষ্ণৌ : ১২৯১ হিঃ), পৃঃ ১৩।*
১০৩. *ছালেহ ফুল্লানী, ঈক্বায় হিমাম পৃঃ ৯৯।*
১০৪. *শা'রানী, কিতাবুল মীযান (দিল্লী ছাপা, ১২৮৬ হিঃ), ১/৭৩ পৃঃ।*

১. 'বালাকোট যুদ্ধের পর ১৮৪০ সালের দিকে আব্দুল হক বেনারসী নামক ব্যক্তির মাধ্যমে দলটির উদ্ভব ঘটে'।

এটি ডাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা। এর বড় প্রমাণ বালাকোট যুদ্ধের সিপাহসালার আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) নিজেই ছিলেন 'আহলেহাদীছ'। যিনি ১২৪৬ হিঃ মোতাবেক ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার পূর্বাহ্নে বালাকোটে শহীদ হন। তাঁর সাথী শত শত মুজাহিদ ছিলেন আহলেহাদীছ। বাংলা ও বিহারের আহলেহাদীছ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের ফসল। আব্দুল হক বেনারসী (১২০৬-৮৬হিঃ) ছিলেন আল্লামা শহীদের সহপাঠি এবং তিনি তাদের সাথে একত্রে হজ্জ করেন। দিল্লীতে লেখাপড়া শেষ করে তিনি ইয়ামনে গিয়ে ইমাম শওকানীর (১১৭২-১২৫০ হিঃ) নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন ও সনদ লাভ করেন'।[১০৫] এর বেশী তাঁর সম্বন্ধে জানা যায় না। বিরোধীরা অনেক নির্দোষ মানুষকে দোষী বানিয়েছে। তাঁকে নিয়ে যদি কেউ মিথ্যা রটনা করে থাকে, সেটা তাদের ব্যাপার। তবে তাঁর মাধ্যমে আহলেহাদীছ দলের উদ্ভব ঘটেছে বলে যে দাবী করা হয়েছে, এটা আকাট মূর্খরাই কেবল করতে পারে। বাংলাদেশে এমনামন বংশ রয়েছে, যারা কয়েক শত বছর যাবৎ আহলেহাদীছ। যেমন বৃহত্তর খুলনা-যশোর, ২৪ পরগনা, হুগলী, বর্ধমান অঞ্চলের আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতা মাওলানা আহমাদ আলীর (১৮৮৩-১৯৭৬ইং) বংশ। তাঁর ৭ম উর্ধ্বতন পুরুষ মাওলানা সৈয়দ শাহ নযীর আলী আল-মাগরেবী প্রথম আরব দেশ থেকে এদেশে হিজরত করেন এবং তাঁর বংশের শুরু থেকে এযাবৎ প্রায় সাতশো বছরের অধিককাল ধরে সবাই 'আহলেহাদীছ'। তাছাড়া এই বংশে চিরকাল প্রতি স্তরে অন্ততঃ একজন করে যোগ্য আলেম ছিলেন'।[১০৬]

২. 'এরাই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও জিহাদকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়'।

অথচ ইংরেজ-বিরোধী জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন আহলেহাদীছগণ। খোদ আল্লামা শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১খৃঃ) ছিলেন যার প্রধান সেনাপতি। বালাকোট-পূর্ববর্তী পাঁচ বছর শিখবিরোধী জিহাদে আহলেহাদীছ হানাফী সকলে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু বিরোধী আলেমদের চক্রান্তে বিশেষ করে মাওলানা মাহবূব আলী প্রমুখের প্ররোচনায় হানাফীদের অনেকে জিহাদ থেকে সটকে পড়েন। মৌলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২১৫-৯০/১৮০০-৭৩খৃঃ) তাদের অন্যতম। তিনি বাংলাদেশে এসে জিহাদ বিরোধী মত প্রকাশ করেন এবং ইংরেজের পক্ষে ফৎওয়া দেন। ১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর কলিকাতা মোহামেডান ল' সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতায় বৃটিশ ভারতকে 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, এক্ষণে মুসলমান প্রজারা তাদের (ইংরেজ) শাসককে সাহায্য করতে এবং শাসকের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের (অর্থাৎ জিহাদী আহলেহাদীছদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকবে। এই সময় শী'আ নেতারাও হানাফী নেতাদের ন্যায় জিহাদ বিরোধী ফৎওয়া প্রকাশ করেন।[১০৭]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, হানাফী ও শী'আ নেতারাই ইংরেজ বিরোধী জিহাদ আন্দোলনকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন। নবাব, নাইট, খানবাহাদুর ও পীর-মাশায়েখ নামধারীরা যখন আরাম-আয়েশে প্রাসাদে ও খানকায় বসে হালুয়া-রুটি আর ওরস-মীলাদ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন মুহাম্মাদী-আহলেহাদীছরা ইংরেজ শাসকদের জেল-যুলুম, ফাঁসি ও দ্বীপান্তরে অকাতরে জীবন বিলাচ্ছিলেন দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। যেমন বাংলাদেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও গবেষক আব্দুল মওদুদ বলেন,

'কালক্রমে বাঙালী জেহাদীরা আহলেহাদিস, লা-মাযহাবী, মওয়াহেদ, মুহম্মদী, গায়ের মুকাল্লিদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছিল ... শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ লড়তে বাঙালী মুসলমানেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং অগণিত অর্থ ও সৈন্য পাঠিয়ে নিজেদের কর্তব্য পালনে তৎপর হয়েছে। সেকালীন বাংলাদেশের প্রত্যেক শহরে তাদের অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের ঘাঁটি ছিল। ... মালদহের (বর্তমানে চাঁপাই নবাবগঞ্জের পাকা-নারায়ণপুর) রফিক মিয়াঁ ও তাঁর পুত্র আমীরুদ্দীনের নাম ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েছে'।[১০৮] সে সময় বিহার ও বাংলা ছিল মুজাহিদ ও রসদ প্রেরণের কেন্দ্রস্থল। আর সেকারণে বিহার, পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশে আহলেহাদীছের সংখ্যা সর্বাধিক। আহলেহাদীছদের সেদিনের ত্যাগের ফলেই বৃটিশ তাড়ানো সম্ভব হয় ও যার ফলশ্রুতিতে পরে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান ও বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

এদিকে ইঙ্গিত করেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ ওসমান গণী বলেন, 'এই মহৎ আন্দোলন স্বাধীনতার পূর্বতন বীজরূপে না রয়ে গেলে আজকের দিনের স্বাধীনতার সোনার ফসল সবুজ শালবন এত সত্বর আদৌ আমাদের হাতে আসত কি? সুতরাং এই আন্দোলনের আবেদন ও অবদান দুই-ই অবর্ণনীয় ও অবিস্মরণীয়'।[১০৯] অতএব অপপ্রচারকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী আহলেহাদীছরা কখনোই ইংরেজের দালালী করেনি এবং খৃষ্টানদের অর্থে বেড়ে ওঠেনি। এটি স্রেফ মূর্খতা সুলভ ও বিদ্বেষপ্রসূত প্রোপাগাণ্ডা মাত্র।

বাংলাদেশে প্রচলিত শিরকী বিশ্বাস ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ সমূহের বিরুদ্ধে বারাসাতের সৈয়দ নিছার আলী তীতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খৃঃ)-এর পরিচালিত 'মুহাম্মাদী আন্দোলন' ও ফরিদপুরের (বর্তমান মাদারীপুরের) হাজী

১০৫. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, ক্রমিক সংখ্যা ৮৫, পৃঃ ২৮০-৮১।*
১০৬. *সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ ২০১১খৃঃ, পৃঃ ৫।*
১০৭. *হান্টার, দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স, অনুবাদঃ আনিসুজ্জামান (ঢাকাঃ ১৯৮২) পরিশিষ্ট-৩ পৃঃ ৯৯-১০৪; ১৯৪।*
১০৮. *আব্দুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন (ঢাকা ১৯৮৫), পৃঃ ১০০।*
১০৯. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, ডক্টরেট থিসিস পৃঃ ১৪-১৫।*

শরী'আতুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০খৃঃ)-এর পরিচালিত 'ফারায়েযী আন্দোলন' ছিল মূলতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই প্রতিরূপ। তীতুমীর ১৮২২ সালে হজ্জে গিয়ে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে বায়'আত করেন। তিনি দেশে ফিরে এসে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদারের বসানো দাড়ির ট্যাক্স ও অন্যান্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন এবং অত্যাচারিত হিন্দু-মুসলিম কৃষক শ্রেণীর পক্ষে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে জিহাদ ও শাহাদাত নছীব হয়। হাজী শরী'আতুল্লাহ ১৭৯৯ থেকে ১৮১৮ খৃঃ পর্যন্ত ১৯ বছর সঊদী আরবে অবস্থান করেন ও সেখানে ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন। অতঃপর দেশে ফিরে সামাজিক কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এদেশকে 'দারুল হরব' (বিধর্মীর রাজ্য) বলে ফৎওয়া দেন। তাতে তিনি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১৮০০-১৮৭৩) ও তার অনুসারী এবং অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ কুঠিয়ালদের চক্ষুশূল হন।[১১০] ফলে তাঁকেও নানাবিধ যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বহু আহলেহাদীছ আজও 'মুহাম্মাদী' 'ফারাযী' নামে পরিচিত।[১১১]

বিজ্ঞপ্তিতে মক্কা-মদীনার আলেমদের যে ফৎওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটা ছিল ইংরেজদের সমর্থনে হানাফী আলেমদের পক্ষে। সে ফৎওয়া তারাই এনেছিলেন এবং তারাই এটা আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে ব্যাপকহারে প্রচার করেছিলেন। যেমন আব্দুল মওদুদ বলেন, 'সমুদ্যত অস্ত্র ও আইনে শৃংখলা পর্যাপ্ত না হওয়ায় দেশপ্রসিদ্ধ আলেমদের, এমনকি মক্কা শরীফের চার মযহাবের প্রধান মুফতীদের ফতোয়া প্রচারের দরকার হয়েছিল ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমানদের ধর্মবুদ্ধিকে প্রভাবিত করবার জন্য। বিদেশী ও বিধর্মীদের শাসনাধিকারে চলে গেলেও এদেশটাকে 'দারুল ইসলাম' হিসাবে মেনে নিয়ে এখানে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে বসবাস করতে ধর্মীয় অনুমোদনও এসব ফতোয়ার দ্বারা লাভ করা হয়েছিল'।[১১২] অতএব কারা সে সময় ইংরেজের দালালী করেছিল ও বৃটিশ সরকারের পদলেহী ছিল, উক্ত লেখনী থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

অনেকে ওলামায়ে দেউবন্দকে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের 'হিরো' বানাবার চেষ্টা করেন। যাকে আদৌ 'জিহাদ' বলা যাবে না। কেননা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়নি। অতঃপর যে ঘটনার ভিত্তিতে উক্ত দাবী করা হয় তা এই যে, ১৮৫৭ সালের মে মাসে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনাপর্বে সাহারানপুর যেলার থানাভুন পরগণার অন্যতম সর্দার কাযী আব্দুর রহীম হাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে সাহারানপুর শহরে যান। সেকালে হাতি ছিল আমীর ও রঈসদের শোভা বর্ধনের মাধ্যম। কিন্তু কাযী ছাহেবের শত্রুরা গোপনে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে তথ্য দেয় যে, তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হাতি কিনতে এসেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এই খবর পেয়েই তাঁকে গ্রেফতার করেন ও কোনরূপ যাচাই-বাছাই না করেই কয়েকজন সঙ্গীসহ তাকে হত্যা করেন। এতে এলাকার লোক ক্ষিপ্ত হয় এবং তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

উল্লেখ্য যে, থানাভুন পরগণার ৩৫ হাযার জনসংখ্যার সাত হাযারই ছিল ইংরেজ সেনাবাহিনীতে কর্মরত'। তার মধ্যে ৩২ জন ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা'।[১১৩] অতএব তাদের ইংরেজ বিরোধী হওয়ার কোন কারণ ছিল না। বরং এটি ছিল প্রতিশোধমূলক একটি স্থানীয় ঘটনা মাত্র।[১১৪] আর সম্ভবতঃ সেকারণেই উইলিয়ম উইলসন হান্টার প্রদত্ত রিপোর্ট, যা 'আওয়ার ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স' নামে ১৮৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, তার সর্বত্র ওয়াহহাবী ও ছাদিকপুরী মুজাহিদদের ইংরেজবিরোধী তৎপরতার আলোচনায় ভরপুর থাকলেও কোথাও সাহারানপুর বা দেউবন্দের মাশায়েখদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি 'ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী' *(হিন্দুস্তানী আলেমদের স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত' ১ম প্রকাশ ১৯৩৯, পরবর্তী প্রকাশ ১৯৫৭)* বইয়ের লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁ খুব বাড়িয়ে-চাড়িয়ে লিখেও অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইতিহাসের একজন ছাত্র বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মালাগড় ও ফরখনগরের মত অখ্যাত স্থান সমূহের নাম পাওয়া গেলেও মুযাফফর নগর ও সাহারানপুর যেলার নাম পাওয়া যায় না (যেখানে দেউবন্দ অবস্থিত)'।[১১৫] বরং ১৮৭৫ সালে উক্ত মাদরাসা কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি মিঃ পামার দেউবন্দ মাদরাসা পরিদর্শন করে এই বলে রিপোর্ট দেন যে, 'এই মাদরাসা সর্বদা বৃটিশ সরকারের অনুগত ও সহযোগী'।[১১৬]

পরবর্তীতে ১৯১৩ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর প্ররোচনায় তৎকালীন মুহতামিম শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান ১৯১৪ সালের পর 'রেশমী রুমাল' ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হয়ে তিনি ও মাওলানা হোসায়েন আহমাদ মাদানীসহ আটজন মাল্টায় ৪ বছর নির্বাসিত থাকেন। বলা হয়ে থাকে যে, এইসব হলুদ রুমালে মাওলানা মাহমূদুল হাসান তুরস্কের খলীফা ও হিজাযের শাসকদের কাছে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে কিছু লোককে ঐসব দেশে পাঠিয়েছিলেন। এই গোপন তথ্য ফাঁস হলে তারা গ্রেফতার হন। এতে দেউবন্দ মাদরাসার পরিচালনা কমিটি বা অন্য কোন নেতৃবৃন্দের সম্মতি ছিল না এবং এ কারণে ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে ১৯১৩ সালে মাদরাসার শিক্ষকতার চাকুরী

---

১১০. *কে.এম. রাইছ উদ্দিন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা (ঢাকা ২০০৬), পৃঃ ৫৭৩-৭৪।*
১১১. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, ডক্টরেট থিসিস,* পৃঃ ৬৩।
১১২. *আব্দুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন পৃঃ ১০১; ফৎওয়াগুলি আনিসুজ্জামান অনূদিত দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স, ঢাকা ১৯৮২, পরিশিষ্ট ১, ২, ৩-য়ে রয়েছে। পৃঃ ১৯১-৯৪।*
১১৩. *ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, বঙ্গানুবাদ ঢাকা, ই. ফা. বা. ২০০৩খৃঃ, ৪/২৮৪, ৪৮৮।*
১১৪. *ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, তাহরীকে জিহাদ (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান : ১৪০৬/১৯৮৬), পৃঃ ৬৮-৬৯।*
১১৫. *মুহাম্মাদ মিঞা, ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, লাহোর ছাপা, ৪/২৪৯ পৃঃ; ঐ, বঙ্গানুবাদ ঢাকা, ৪/২৬৫।*
১১৬. *তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৭১।*

হ'তে বহিষ্কার করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইনি নও মুসলিম শিখ ছিলেন এবং ১৯০৯ সালে ইনি দেউবন্দের শিক্ষক হওয়ার আগ পর্যন্ত এই মাদরাসার কোন ব্যক্তি ইংরেজের আনুগত্য বিরোধী কোন কাজে অংশ নেননি।[117] বরং ১৯১১ সালে 'জমঈয়াতুল আনছার' (সাহায্যকারীদের দল) নামে শায়খুল হিন্দ যে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রস্তাবনা সমূহের মধ্যে অন্যতম প্রস্তাবনা ছিল, 'সরকারের আনুগত্যের প্রতি জনগণকে নির্দেশনা প্রদান'।[118]

বস্তুতঃ ১৯১৩ সালে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেউবন্দ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সর্বদা ইংরেজ শাসকদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক রেখে চলেন এবং ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে বের করে দেবার পর তারা ইউ,পি-র ইংরেজ গভর্ণরকে মাদরাসায় আমন্ত্রণ জানান। গভর্ণর জেম্স মিসটন খুশীমনে এখানে আসেন ও বক্তৃতা করেন। অতঃপর মুহতামিম হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদকে 'শামসুল ওলামা' (আলেমদের সূর্য) উপাধিতে ভূষিত করেন। এই মুহতামিম ছিলেন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ ক্বাসেম নানুতুবীর পুত্র।[119] ১৯১৭ সালের ৬ই নভেম্বর মাওলানা মাহমূদুল হাসান ও অন্যদের মুক্তির জন্য 'ওলামায়ে দেউবন্দ'-এর পক্ষ হ'তে ইংরেজ সরকারের নিকটে যে আবেদন পেশ করা হয়, তাতে তারা বলেন যে, স্রেফ সন্দেহবশে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নইলে বিগত ৩০/৪০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলছি যে, তিনি সহ সমস্ত দেউবন্দী জামা'আত সর্বদা নিশ্চুপ ও রাজনীতিমুক্ত একটি জামা'আত।[120] এতে বুঝা যায় যে, ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ বা ১৯১৪ সালের 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র' কোনটাতেই তারা যুক্ত ছিলেন না। বরং সর্বদা ইংরেজ তোষণে ব্যাপৃত থেকেছেন।

৩. সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ) ও তাঁর আক্বীদা :

আমীরুল মুজাহেদীন সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী (১২০১-৪৬/১৭৮৬-১৮৩১খৃঃ) ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়াতে দু'বছর পড়াশুনা করেন। পরে তিনি টোংকের নবাব আমীর খান পিণ্ডারীর সেনাবাহিনীতে সাত বছর চাকুরী করেন। কিন্তু আমীর খান ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করায় তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের পরিকল্পনা করেন। তিনি তৎকালীন ভারতের ইলমী রাজধানী দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবারের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেন। অতঃপর উস্তাদ মাওলানা আব্দুল আযীয দেহলভীর ইঙ্গিতে মাওলানা আব্দুল হাই ও মাওলানা শাহ ইসমাঈল তাঁর হাতে জিহাদের বায়'আত করেন।

সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সবটুকুই ছিল শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আযীযের লেখনী ও শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত। তিনি বাহ্যত হানাফী ছিলেন। এজন্য সেযুগের কঠিন সামাজিক কূপমণ্ডূকতাই সম্ভবতঃ দায়ী ছিল। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমষ্টি 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর মধ্যে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, 'সাধারণভাবে যে চার মাযহাবের অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তা সঠিক। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ)-এর ইল্মকে কোন নির্দিষ্ট একজন মুজতাহিদ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ধারণা করা ঠিক নয়। যদি কোন মাসআলায় বিশুদ্ধ, স্পষ্ট ও গায়ের মানসূখ হাদীছ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কোন মুজতাহিদের অনুসরণ করা চলবে না। মুহাদ্দিছগণকে এ ব্যাপারে অনুসরণীয় গণ্য করতে হবে'।[121] এখানে তিনি তৎকালীন নিয়মানুযায়ী কোন হানাফী বিদ্বানের তাকলীদ না করে মুহাদ্দিছ তথা আহলেহাদীছ বিদ্বানের নিকট থেকে মাসআলা জেনে নেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য, সৈয়দ আহমদের উপরোক্ত বক্তব্য আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই যথার্থ প্রতিধ্বনি'।[122] অতএব সৈয়দ আহমদ (রহঃ)-কে শিরক ও বিদ'আতপন্থী সাধারণ হানাফী ভাবা ঠিক নয়।

অনেকে তাঁদের আন্দোলনকে 'তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়া' আন্দোলন বলতে চেয়েছেন[123] এবং আহলেহাদীছদেরকে সেই আন্দোলনের একটি 'বিচ্ছিন্ন উপদল' হিসাবে গণ্য করতে চেয়েছেন। অথচ বাস্তব কথা এই যে, তারা প্রচলিত চিশতিয়া, কাদেরিয়া ইত্যাদি তরীকার ন্যায় নিয়মবদ্ধ কোন তরীকার প্রবর্তক ছিলেন না। বরং তাক্বলীদ-নির্ভর যে ইসলাম তৎকালীন ভারতীয় মুসলিম সমাজে চালু ছিল, শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ ইসমাঈলের শিক্ষা ছিল তার বিপরীত। মুসলিম সমাজকে 'আমল বিল হাদীছে'র প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ও বিদ্বানদের উদ্ভাবিত তরীকার বদলে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসরণের প্রতি আহ্বানই ছিল শাহ অলিউল্লাহ, শাহ ইসমাঈল, সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী ও বেলায়েত আলী-এনায়েত আলীর আন্দোলনের মূল সুর। তাদের এই দাওয়াত ছিল মূলতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই দাওয়াত'।[124] আর সেকারণেই তাঁদের আন্দোলনের ফলে হাযার হাযার মানুষ তাক্বলীদ ছেড়ে 'আহলেহাদীছ' হয়েছেন।

৪. ৩/১২/১৮৮৬ ইং তারিখের ১৭৫৮ নং স্মারকে পাঞ্জাব সরকার আবেদনকারী লা-মাযহাবী দলটির নেতা মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালভীর দরখাস্ত মনযুর করেন এবং তখন থেকে এদের নাম ওহাবী বা লা-মাযহাবীর পরিবর্তে আহলেহাদীছ রাখা হয়। **উক্ত অপপ্রচারের জবাব নিম্নরূপ :**

বালাকোট পরবর্তী জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব পাটনার ছাদিকপুরী আহলেহাদীছ পরিবারের উপরে আসে। ফলে এর পরবর্তী শতবর্ষব্যাপী জিহাদ আন্দোলন মূলতঃ

---

১১৭. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।*
১১৮. ঐ, পৃঃ ৭৩, টীকা-১।
১১৯. *তাহরীকে জিহাদ পৃঃ ৭৫-৭৬।*
১২০. *ঐ, পৃঃ ৮৯, ৯৪।*

১২১. *ছিরাতে মুস্তাক্বীম, করাচী ছাপা, পৃঃ ১১৩।*
১২২. *থিসিস পৃঃ ২৫৬-৫৭, ২৬৫।*
১২৩. *তাঁদের এই ধারণার ভিত্তি হ'ল সাইয়িদ (রহঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি : 'আমার তরীকা হ'ল তাই-ই, যা আমার ঊর্ধ্বতন দাদা সাইয়িদুল মুরসালীন (ছাঃ) এখতিয়ার করেছিলেন। একদিন শুকনা রুটি পেটভরে খেয়ে নিই ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। একদিন ভূখা থাকি ও ধৈর্য ধারণ করি' (থিসিস পৃঃ ২৬৯, দ্রঃ টীকা-২৯)। অথচ একটা উক্তির ভিত্তিতে একটা তরীকার জন্ম হয় না। তাছাড়া উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*
১২৪. *থিসিস, পৃঃ ২৬৮-৭০।*

আহলেহাদীছদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। ইংরেজের অনুগত হানাফী আলেমরা তখন আহলেহাদীছদেরকে ওয়াহহাবী, রাফাদানী, লা-মাযহাবী, গায়ের মুক্বাল্লিদ, বেদ্বীন ইত্যাদি নামে সর্বত্র অপবাদ রটাতো। আর তাদেরই নিরন্তর অপপ্রচারে ও ষড়যন্ত্রে ইংরেজ শাসকরা আহলেহাদীছ পেলেই তাকে জিহাদী, ওয়াহহাবী বলে গ্রেফতার করত। আর তাদের ভাগ্যে নেমে আসত জেল-যুলুম, ফাঁসি, দ্বীপান্তর ইত্যাদি নানাবিধ নির্যাতনের স্টীম রোলার।

মাওলানা মুহাম্মাদ হোসায়েন বাটালবী (মৃত: ১৯২০ খৃঃ) তাঁর দরখাস্তের মাধ্যমে ওয়াহহাবী ও আহলেহাদীছ এক নয় সেটা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এর দ্বারা তিনি সাধারণ নিরীহ আহলেহাদীছদেরকে ইংরেজের জেল-যুলুম হ'তে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর জন্য সমস্ত আহলেহাদীছকে ইংরেজের অনুগত প্রমাণ করার যে ব্যর্থ চেষ্টা কোন কোন মহল থেকে লক্ষ্য করা গেছে, তা কোনক্রমেই ঠিক নয়'।[১২৫] মনে রাখা আবশ্যক যে, এই থিসিসের পরীক্ষক মণ্ডলী ছিলেন রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য হানাফী প্রফেসরগণ এবং তাঁদের অনেকে ছিলেন পীরপন্থী। এরপরেও তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত থিসিস পাস করে দিয়েছেন। ১৯৯৬ সালে এটি গ্রন্থাকারে (৫৩৮ পৃঃ) প্রকাশিত হয়েছে এবং বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

৫. 'এরা হানাফিদের মুশরিক বলতেও দ্বিধা করে না'।

জবাব: যেসব লোক কবরপূজা করে এবং কবরবাসী মৃতব্যক্তির অসীলায় আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলে বিশ্বাস করে, সেসব ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুশরিক। আরবের মুশরিকরাও মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলে বিশ্বাস করত *(যুমার ৩)*।

বাংলাদেশের প্রায় সকল কবরপূজা কথিত হানাফী নামধারী কিছু বিভ্রান্ত লোকেরাই করে থাকে। অতএব তাদেরকে মুশরিক বলায় কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচের অবকাশ নেই। যদিও তাদেরকে সরাসরি কেউ মুশরিক বলেন না। তবে কথায় বলে, 'ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাইনি'।

৬. 'তারা বলে হানাফীদের নামাজই হয় না'।

জবাব : এর অর্থ হানাফীদের ছালাত রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী হয় না। উদাহরণ স্বরূপঃ (১) হানাফীরা ছালাতের পূর্বেই জায়নামাযের দো'আ পড়েন (২) তাহরীমা বাঁধার পর নিয়তের নামে 'নাওয়াইতু আন' পড়েন, যা একেবারেই বানোয়াট (৩) যঈফ হাদীছ জানা সত্ত্বেও স্রেফ মযহাবের দোহাই পেড়ে হানাফী পুরুষেরা নাভির নীচে হাত বাঁধেন ও মহিলারা বুকের উপর হাত বাঁধেন (৪) একই দোহাই পেড়ে হানাফী মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা বর্জন করেন (৫) একই দোহাই পেড়ে জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' নীরবে পড়েন (৬) একই দোহাই পেড়ে রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে ওঠা এবং তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়াবার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন- এর ছহীহ মুতাওয়াতির সুন্নাত পরিত্যাগ করেন (৭) একই দোহাই পেড়ে সিজদা থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় মাটিতে হাতে ভর না দিয়ে তীরের মত সোজা উঠে দাঁড়ান (৮) একই দোহাই পেড়ে কাতারে দাঁড়িয়ে দুই মুছল্লীর পায়ের মাঝে ফাঁক রাখেন এবং এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী কাতারের মাঝে 'কালো বকরীর ন্যায় শয়তান'কে সর্বদা লালন করেন (৯) একই দোহাই পেড়ে তা'দীলে আরকান তথা ধীরে-সুস্থে ছালাত আদায় না করে দ্রুত ছালাত পড়েন (১০) একই দোহাই পেড়ে হানাফী মহিলাগণ সিজদায় গিয়ে মাটিতে নিতম্ব রাখেন। ফলে সারা জীবন তারা সঠিকভাবে সিজদা ছাড়াই ছালাত আদায় করেন (১১) একই দোহাই পেড়ে হানাফী মুছল্লীগণ দুই সিজদার মাঝে বৈঠকে বসে সুন্নাতী দো'আ পাঠ করা হ'তে বিরত থাকেন (১২) একই দোহাই পেড়ে হানাফী খত্বীবগণ জুম'আর দিন মুছল্লীদের মাতৃভাষায় মূল খুৎবা না দিয়ে আগেই মিম্বরে বসে বাংলায় তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু করেছেন। অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সর্বদা স্বীয় মাতৃভাষায় দাঁড়িয়ে দুই খুৎবা দিয়েছেন (১৩) একই দোহাই পেড়ে হানাফী মুছল্লীগণ ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত ১২ তাকবীরের স্থলে ৬ তাকবীর দেন। তাও আবার দুই রাক'আতে দুই তরীকায় (১৪) একই দোহাই পেড়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত ৮ রাক'আত তারাবীহ-তাহাজ্জুদ বাদ দিয়ে তারা ২০ রাক'আত পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণের উপর ইজমা-এর নামে মিথ্যারোপ করেন (১৫) একই দোহাই পেড়ে তারা জানাযার ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর জ্বলজ্যান্ত সুন্নাত সূরা ফাতেহা পাঠ করেন না। অথচ যেটা রাসূল (ছাঃ) করেননি, সেই 'নিয়ত' পাঠ করেন ও 'ছানা' পড়েন (১৬) একই দোহাই পেড়ে তারা সফরে ছালাত জমা ও ক্বছর করেন না। এমনকি হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানেও যোহর ও আছর জমা ও ক্বছর না করে পৃথকভাবে সুন্নাত সহ পুরা ছালাত আদায় করেন।

এসবই তারা সারা জীবন করে যাচ্ছেন হানাফী মাযহাবের দোহাই পেড়ে। অথচ মাযহাব মানা ফরয নয়, বরং ছহীহ হাদীছ মানা ফরয। তাছাড়া সবই করা হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নামে। অথচ তিনি পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন 'ছহীহ হাদীছই আমার মযহাব'।[১২৬] অতএব প্রকৃত হানাফী কেবল তিনিই হ'তে পারেন, যিনি সর্বক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ মেনে চলেন। আহলেহাদীছগণ যেটা করে থাকেন।

আমরা বলতে চাই যিনি জেনে-শুনে সারা জীবন বাপ-দাদা কিংবা মাযহাবের দোহাই দিয়ে ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করেন, তিনি কি রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্য নন? তাঁর ছালাত কিভাবে কবুল হবে? তিনি কিভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত আশা করতে পারেন? রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা আল্লাহ্র অবাধ্যতার শামিল। অতএব হে অবাধ্য মুছল্লী! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করে কোন্ আকাশ তোমাকে ছায়া দিবে? কোন যমীন তোমাকে আশ্রয় দিবে? অতএব সাবধান হও! মৃত্যুর আগেই তওবা করে ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়। নইলে ক্বিয়ামতের দিন

১২৫. *থিসিস পৃঃ ২৭৫।*

১২৬. *রাদ্দুল মুহতার ওরফে ফাতাওয়া শামী, (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯/১৯৭৯), ১/৬৭।*

আফসোস ব্যতীত তোমার ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না *(বাক্বারাহ ১৬৭)*। কোন ইমাম, পীর বা মুরব্বী তোমার জন্য সেদিন সুফারিশ করবে না।

৭. এই গুমরাহ দলটি...

জবাব : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী ও অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য মতে প্রকৃত আহলেহাদীছ যারা, কেবল তারাই 'নাজী' ফের্কা। ইমাম আবুদাউদ (২০২-২৭৫ হিঃ) বলেন, এই দলটি না থাকলে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'। বাকী মু'তাযিলা, মুর্জিয়া, হানাফী সহ সবাই গুমরাহ দল ৭২ ফের্কার অন্তর্ভুক্ত'। এই ভাগটি করেছেন হানাফীদের শ্রদ্ধেয় 'বড় পীর' শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ)।[১২৭] যাঁর মৃত্যুদিবস হিসাবে তারা 'ফাতেহা ইয়াযদহম' বা এগারো শরীফ পালন করে থাকেন। অতএব এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। আল্লাহ সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর যথাযথভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৮. প্রচারে : 'বেদয়াতী দমন কমিটি' ...

জবাব : কথায় বলে 'অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন'। এভাবে চিরকাল বিদ'আতীরাই আহলেহাদীছকে বিভিন্ন বাজে নামে অভিহিত করেছে। বস্তুত: কুরআন-হাদীছ ছেড়ে কোন ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করে কোন মুসলমানের নামকরণ করাটাই তো আসল বিদ'আত। এরপরে নিজেদের রায়-ক্বিয়াস ও জাল-যঈফ হাদীছে ভরা এবং নিজেদের আবিষ্কৃত অসংখ্য বিদ'আত, যেমন- মীলাদ-ক্বিয়াম, শবেবরাত, কুলখানি-চেহলাম, পীরপূজা, গোরপূজা, ওরস, চিল্লা, আখেরী মুনাজাত এবং তাযকিয়ায়ে নফসের নামে আবিষ্কৃত শত রকমের মারেফতী কসরৎ ও সরকারী হিসাব মতে দেশের অন্যূন ২ লক্ষ ৯৮ হাযার পীরের নতুন নতুন ফৎওয়া ও শিরক-বিদ'আতের জগাখিচুড়ীকে ঢালাওভাবে 'হানাফী মাযহাব' বলে চালানো কি নির্দোষ ইমামের উপর চালানো নিকৃষ্টতম অপবাদ নয়? ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কি এসব করতেন? তিনি কি এসব কাজের অনুমতি দিয়েছেন? তাঁর মাযহাব কি ছিল, সে ব্যাপারে তাঁর লিখিত কোন কিতাব দুনিয়াতে আছে কি? যদি না থাকে, তাহ'লে তাঁর নাম ভাঙিয়ে নিজেদের 'হানাফী' বলে মানুষকে প্রতারণা করার অর্থ কি? অতএব 'বেদয়াতী দমন কমিটি' না বলে মুখোশ খুলে ফেলে নিজেদেরকে সরাসরি বিদ'আতী নামে অভিহিত করে সৎসাহসের পরিচয় দেওয়াই ভাল হবে। কেননা সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন হক-এর নিজস্ব শক্তিতে বিদ'আত অপসৃত হবে ইনশাআল্লাহ। বানোয়াট মাযহাব ও তরীকার মোহজাল ছিন্ন করে হকপন্থী মানুষ সত্যের সন্ধানে ছুটে আসবে চুম্বকের মত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে।

মনে রাখা আবশ্যক যে, 'আহলেহাদীছ' প্রচলিত অর্থে কোন ফের্কা বা মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় হেদায়াত এ পথেই মওজুদ রয়েছে। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সেই জান্নাতী পথেই মানুষকে আহ্বান জানায়।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার সহযোগী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে এবং সমমনা ব্যক্তিগণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে যখন ব্যাপকহারে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার দাওয়াত ব্যাপ্তি লাভ করছে এবং দলে দলে মানুষ বাপ-দাদার মাযহাব ছেড়ে 'আহলেহাদীছ' হচ্ছেন, তখন সমাজের একদল কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক ধর্মনেতার গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। এরা আহলেহাদীছ-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ গীবত-তোহমত ও অপবাদ রটাচ্ছেন। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের পার্টনার হিসাবে এদের একটি দল আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জেল-যুলুমের শিকার বানিয়েছিল। এখন তাদের অন্য দলগুলি মাঠ গরম করছে। এইসব পুঁজিবাদী রাজনৈতিক পীর ছাহেবদের বহুদিনের খাদেম ও মুরীদরা যখন তওবা করে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যাচ্ছেন, তখন এঁরা চোখে সর্ষেফুল দেখছেন, আর প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। তারা সম্প্রতি 'হানাফী ঐক্য পরিষদ' 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামায়াত পরিষদ' 'ওলামা পরিষদ' ইত্যাদি নামকাওয়াস্তে সংগঠন কায়েম করে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের কাছে নোংরা তাদের বই-পত্র এবং চ্যালেঞ্জের চিঠি ও কাগজ-পত্র পাঠাচ্ছেন। এরা কেউ দেশে 'ইসলামী হুকুমত' কেউ 'ইসলামী খেলাফত' কেউ 'ইসলামী শাসনতন্ত্র' ইত্যাদি কায়েমের শ্লোগান দিয়ে রাজনীতির মাঠ গরম করেন। এরা নিজেরা মওদূদী-তাবলীগী, চরমোনাই-দেওয়ানবাগী, আটরশী-মাইজভাণ্ডারী, রিযভী-ওহাবী ইত্যাদি নামে পারস্পরিক দলাদলি ও হানাহানিতে ক্ষত-বিক্ষত। অথচ আহলেহাদীছকে বলছেন 'মুনকিরে হাদীছ'।[১২৮] লজ্জা-শরমের বালাই থাকলে এরূপ কথা তারা লিখে প্রচার করতেন না। আমরা বলি, অতিভক্তি ও অতি বিদ্বেষ পরিহার করুন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার শপথ নিন। নিজেদের কিছু ভুল থাকলে তা সংশোধন করুন। মুসলমানদের পরস্পরের ভাই হওয়ার সুযোগ দিন। তাদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধির পরিবেশ তৈরী করুন। তাহলে দেশে আল্লাহর বিশেষ রহমত নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তুমি তোমার প্রিয় বান্দাদেরকে তোমার নির্ভেজাল দ্বীনের প্রতি এবং তোমার প্রেরিত ছিরাতে মুস্তাক্বীমের প্রতি হেদায়াত দান কর- আমীন! *(স.স.)*।

১২৭. *কিতাবুল গুনিয়াহ, মিসরী ছাপা, ১/১০৩; শহরস্তানী, আল-মিলাল, বৈরূত ছাপা, ১/১৪৬।*

১২৮. *মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, দেশের শীর্ষ ওলামায়ে কেরাম ও কথিত আহলেহাদীসের আলোচিত বাহাস (প্রকাশক : ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন, ঢাকা মহানগর-পূর্ব, ঢাকা : ২০১২) পৃঃ ২২।*

মহিলাদের পাতা

নিজে বাঁচুন এবং আহাল-পরিবারকে বাঁচান!

*হাজেরা বিনতে ইবরাহীম**

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে- তাদেরকে আর্দশ সন্তান হিসাবে গড়ে তোলা। আর ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য হবে তাদেরকে জাহান্নাম হ'তে রক্ষা করা। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُوْنَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে আগুন (জাহান্নাম) হ'তে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ, রূঢ় ও নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে, যারা কখনই আল্লাহ্র কথা অমান্য করে না এবং নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে' *(তাহরীম ৬)*।

আজকাল পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দানের জন্য অনেক চেষ্টা করে থাকেন। এমনকি তারা সন্তানকে শুধু স্কুলে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন না; বরং ক্লাসের পরে প্রাইভেট, কোচিং ইত্যাদির মাধ্যমে সন্তানদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। প্রশ্ন হচ্ছে অভিভাবকরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন যে, তাদের সন্তানের উপর আল্লাহ কোন বিদ্যা শিক্ষা করা ফরয করেছেন?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরয'।[১২৯] আর সেটা হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষা তথা দ্বীনী শিক্ষা। এ শিক্ষায় যদি সন্তানদের শিক্ষিত করে না তোলা হয়, তাহ'লে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কেননা দুনিয়াবী শিক্ষা হচ্ছে বস্তুবাদী শিক্ষা। আর দ্বীনী শিক্ষা হচ্ছে আখেরাতমুখী শিক্ষা। যে শিক্ষা মানুষকে তার স্রষ্টার সন্ধান দেয় এবং পরকালে চূড়ান্ত সফলতার দিকে মানুষকে ধাবিত করে। দ্বীনী শিক্ষা ঠিক রেখে অপরাপর জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে। তবে কখনো দ্বীনী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে অন্য কোন বিদ্যা অর্জন করা সমীচীন নয়। এতে বরং পদচ্যুত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই থেকে যায়।

সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতাই প্রধানত দায়িত্বশীল। কেননা পারিবারিক স্কুলেই তার শিক্ষার হাতে খড়ি। সেকারণ পিতা-মাতাকে দায়িত্ব সচেতন হ'তে হবে। অন্যথা ক্বিয়ামতের দিনে লা জওয়াব হয়ে যেতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه فَالأَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِه وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِه وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِه وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه-

'সাবধান তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। ক্বিয়ামতের দিন তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসার এবং সন্তানের উপর দায়িত্বশীল। ক্বিয়ামতের দিন তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এমনকি দাস-দাসীও তার মালিকের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সেইদিন তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই ক্বিয়ামতের দিন এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে'।[১৩০]

অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, আজকাল অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত না করে দুনিয়াবী বিষয়ে শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের উচিৎ দুনিয়াবী শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনী শিক্ষায় সন্তানদেরকে শিক্ষিত করা। কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছে আল্লাহ জাহান্নামের ভয়াবহতা পেশ করেছেন এবং পরিবারের প্রধানকে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন এবং পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তান-সন্ততির প্রতি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, তাদেরকে সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়ে, আল্লাহ্র ভয় দেখিয়ে ভাল কাজ-কর্মে অভ্যস্ত করা এবং এর মাধ্যমে পরকালে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। এ প্রসঙ্গে কুরআনে উল্লিখিত লোক্বমান কর্তৃক স্বীয় পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশবাণী বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উপদেশগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হ'ল-

(১) লোক্বমান স্বীয় পুত্রকে শিরক থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। যা কুরআনে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে-

* *শিক্ষিকা, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১২৯. *ইবনু মাজাহ, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২১৮।*

১৩০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫।*

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِه وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

'স্মরণ কর, যখন লোক্বমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় যুলুম' *(লোক্বমান ১৩)*। উল্লেখ্য যে, শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ. 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(মায়েদাহ ৭২)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার গোনাহ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' *(নিসা ৪৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ – 'তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে, তুমি আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৬৫)*।

(২) লোক্বমান তাঁর ছেলেকে সব ধরনের শিরক পরিহার করার উপদেশ প্রদানের পর আল্লাহ্র ক্ষমতা অবহিত করেন। আল্লাহ্র জ্ঞান অসীম। তিনি সবকিছু অবগত। তোমাকে সর্বপ্রকার গোপন ও প্রকাশ্য অন্যায় থেকে বিরত থাকতে হবে এবং পরকালে বিচারের দিনে অণু পরিমাণ ভাল কিংবা মন্দ কাজের ফল ভোগ করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। লোক্বমান বলেন, يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ. 'হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত' *(লোক্বমান ১৭)*।

(৩) দুনিয়াতে যে কাজ একান্ত যরূরী তা হচ্ছে ছালাত আদায় করা। লোক্বমান স্বীয় পুত্রকে ছালাতের উপদেশ দিয়ে বলেন, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ 'হে প্রিয় বৎস! ছালাত কায়েম কর' *(লোক্বমান ১৭)*। উল্লেখ্য যে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'আপনি আপনার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন' *(ত্বহা ১৩২)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতাকে সন্তানদের উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ছালাত শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তাকীদ করেছেন। কেননা ছালাত অশ্লীল কাজ হ'তে মানুষকে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীল এবং মন্দ কাজ হ'তে বিরত রাখে' *(আন'কাবূত ৪৫)*। যদি কেউ সঠিকভাবে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে সে সহজে মন্দ কাজ করতে পারবে না।

(৪) ভালকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ করার উপদেশ দিয়ে লোক্বমান তাঁর প্রিয় পুত্রকে বলেন, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'ভাল কাজের আদেশ দাও এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ কর' *(লোক্বমান ১৭)*।

ঈমানদার ব্যক্তি কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকতে পারে না। বরং পরিবার, সমাজ ও জাতির ভাল-মন্দ সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা তার কর্তব্য। তার অন্যতম দায়িত্ব হ'ল সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা। আর সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করার কারণে তাকে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তারা যাতে হক্বের উপরে সুদৃঢ় থাকে এবং সাহসিকতার সাথে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে এমন শিক্ষা দিতে হবে। শক্তিধর যালিমদের মুখোমুখি দাঁড়াতেও যেন তারা ভয় না পায়। অন্যায়কে নীরবে সহ্য করার মতো কাপুরুষতা যেন তাদের ভিতরে কখনো প্রবেশ করতে না পারে, এ শিক্ষাও সন্তানদেরকে দিতে হবে।

(৫) ছবর বা ধৈর্য-সহিষ্ণুতার নির্দেশ দিয়ে লোক্বমান তাঁর পুত্রকে বলেন, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ 'আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটাতো দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(লোক্বমান ১৭)*। বিপদে-আপদে মুষড়ে না পড়ে সন্তানরা যেন ধৈর্য ধারণ করে এ দীক্ষা তাদেরকে দিতে হবে।

(৬) লোক্বমান তাঁর পুত্রকে মানুষ থেকে বিমুখ না হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন, وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ 'তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না' *(লোক্বমান ১৮)*।

মূলতঃ সন্তানকে এ শিক্ষা দিতে হবে যে, তারা যেন নিজেদেরকে সাধারণ মানুষ মনে করে। নিজেকে বড় ভেবে কখনো যেন অন্যের দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। কেননা অন্যকে অবজ্ঞা করে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অহংকারের নামান্তর। আর অহংকার মানুষকে সত্য হ'তে বিমুখ রাখে। যেমন অহংকারের কারণে সত্য হ'তে বিমুখ হয়েছিল ইবলীস। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلاَّ إِبْلِيْسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ

الْكَــافِرِيْنَ– 'আর আমি যখন ফিরিশতাগণকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলে সিজদা করল, সে অগ্রাহ্য এবং অহংকার করল। আর কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ৩৪)*।

(৭) লোক্বমান স্বীয় পুত্রকে অহংকার না করার উপদেশ দিয়ে বলেন, وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُــلَّ مُخْتَالٍ فَخُــوْرٍ 'যমীনের উপর অহংকার বশে চলাফেরা কর না। আল্লাহ কোন আত্মগর্বী ও দাম্ভিককে পসন্দ করেন না' *(লোক্বমান ১৮)*। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, দাম্ভিক ও অহংকারীরা আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ করতে পারে না।

অহংকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন, وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً 'তুমি যমীনে দম্ভ ভরে চলাফেরা করো না। তুমি পদভারে কখনোই যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনই পর্বত প্রমাণ হ'তে পারবে না' *(বাণী ইসরাঈল ৩৭)*।

(৮) লোক্বমান তাঁর পুত্রকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে বলেন, وَاقْصِدْ فِــيْ مَــشْيِكَ 'আর তুমি তোমার চাল চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর' *(লোক্বমান ১৯)*। মধ্যম পন্থায় চলাচলের কারণে মানুষ সম্মানিত হয়। তাই সন্তানদেরকে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিতে হবে।

(৯) লোক্বমান তাঁর পুত্রকে নিম্নস্বরে কথা বলার উপদেশ দিয়ে বলেন, وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَــرَ الْأَصْــوَاتِ لَــصَوْتُ الْحَمِيْــرِ 'আর তোমার কণ্ঠস্বর নিচু কর। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে সবচেয়ে কর্কশ আওয়াজ হ'ল গাধার আওয়াজ' *(লোক্বমান ১৯)*।

উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা শালীনতা বিরোধী। সভ্য সমাজ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা পসন্দ করে না। তাই সন্তানদেরকে নরম ও সুন্দর ভাষায় কথা বলা শিক্ষা দিতে হবে।

পিতা-মাতার দায়িত্ব হ'ল, সন্তানকে লোক্বমানের ন্যায় উপদেশ দেয়া, যা তিনি তার প্রিয় পুত্রকে দিয়েছিলেন। এ দায়িত্ব পালন করা পিতা-মাতার একান্ত কর্তব্য। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِيْ آدَمَ سَيِّدٌ، فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তান প্রত্যেকেই কর্তা। সুতরাং পুরুষ তার পরিবারের কর্তা এবং নারী তার ঘরের কর্ত্রী'।[১৩১]

১৩১. *ছহীহুল জামে' হা/৪৫৬৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৪১।*

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, সন্তানকে আদর্শ সন্তান রূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতার। পিতা-মাতার কারণে সন্তান আদর্শবান হয় এবং তাদের কারণেই সন্তান দুশ্চরিত্রের অধিকারী হয়। তেমনি পিতা-মাতার কারণে সন্তান বিভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে থাকে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক সন্তান ইসলামী স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসক রূপে গড়ে তোলে'।[১৩২]

অপরদিকে সন্তানকে আদর্শবান রূপে গড়ে তুলতে পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হ'ল তাদের জন্য সৎ সঙ্গী খুঁজে বের করা। যেমন বলা হয়ে থাকে, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً–

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'উত্তম সঙ্গী ও মন্দ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মিশক আম্বর ও হাপর ওয়ালার ন্যায়। মিশক আম্বর ওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করতে পারবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি সুগন্ধি লাভ করবে। আর হাপর ওয়ালা তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে'।[১৩৩] এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গীর কারণে সন্তান বিভিন্ন স্বভাবের হ'তে পারে। তাই এই দিকে পিতা-মাতার বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিৎ।

পরিশেষে বলব, পিতা-মাতা সন্তান নিয়ে পরিবার। পিতা-মাতা পরিবারের মূল। সন্তানকে আদর্শবান করে গড়ে তোলার দায়িত্ব তাদেরই। তাই তাদেরকে এ বিষয়ে যত্নবান হ'তে হবে। আর সন্তান আদর্শবান ও ইসলামী মন-মানসিকতায় গড়ে উঠে যথাযথ ইবাদত করতে পারলে জান্নাতে যেতে পারবে। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতাকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়ে নিজেকে ও তার পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

১৩২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০।*
১৩৩. *বুখারী হা/৫৫৩৪।*

হাদীছের গল্প

জান্নাতে প্রবেশকারী বান্দার সাথে আল্লাহর কথোপকথন

মুমিন তার পাপের কারণে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। কিন্তু তার ঈমানের কারণে এক সময় সে জান্নাতে যাবে। জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে যে কথোপকথন হবে, সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? অতঃপর আবূ হুরায়রা (রাঃ) হাদীছের বাকী অংশ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ হুরায়রা (রাঃ) 'আল্লাহ্র পায়ের নলা প্রকাশ করবেন' এ কথাটি উল্লেখ করেননি। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের উপর পুলছিরাত স্থাপন করা হবে। সে সময় রাসূলগণের মধ্যে আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম পুলছিরাত পার হব। সেদিন পুলছিরাত পার হওয়ার সময় রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবেন না। আর রাসূলগণ শুধু বলবেন, সাল্লিম সাল্লিম, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ। আর জাহান্নামের মধ্যে সাদানের কাঁটার ন্যায় আংটা থাকবে, সেগুলি সাদানের কাঁটার মত তবে সেগুলি কত বড় তা আল্লাহই ভাল জানেন। ঐ আংটাগুলি মানুষকে তার আমল অনুপাতে আঁকড়ে ধরবে। সুতরাং কিছু লোক নিজ আমলের কারণে ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, পরে আবার নাজাত পাবে। অবশেষে যখন আল্লাহ বিচার শেষ করবেন, নিজের বিশেষ দয়া দ্বারা কিছু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা করবেন। আর যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ করবেন যে, যারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করেছে তাদেরকে জাহান্নাম হ'তে বের করে আন। তখন তারা ঐ সমস্ত লোকদের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন এবং জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। আর আল্লাহ সিজদা চিহ্নিত স্থানসমূহ আগুনের জন্য জ্বালানো হারাম করে দিয়েছেন। ফলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি মানুষের সিজদার স্থান ব্যতীত জাহান্নামের আগুন গোটা দেহটি জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। সুতরাং তাদেরকে এমন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম হ'তে বের করা হবে যে, তারা একেবারে কয়লা হয়ে যাবে। তখন তাদের উপর হায়াত দান করা পানি ঢেলে দেওয়া হবে। এতে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমন কোন বীজ পানির স্রোতের ধারে সজীব হয়ে উঠে। সে সময় জাহান্নাম হ'তে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী এক ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে থেকে যাবে, যার মুখ হবে জাহান্নামের দিকে। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জাহান্নামের দিক হ'তে আমার মুখখানা ফিরিয়ে দিন। কারণ জাহান্নামের উত্তপ্ত হাওয়া আমাকে অত্যধিক কষ্ট দিচ্ছে এবং তার অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করে ফেলছে। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি যা চাচ্ছ তা দিলে আর অন্য কিছু চাইবে কি? তখন সে বলবে, আপনার সম্মানের কসম করে বলছি, আমি আর কিছুই চাইব না। আর সে আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তার মুখকে জাহান্নামের দিক হ'তে ঘুরিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ করবে এবং তার চাকচিক্য ও শ্যামল দৃশ্য দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ যতক্ষণ চুপ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ চুপ থাকবে। তারপর বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যান। এ কথা শুনে আল্লাহ বলবেন, তুমি কি প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তুমি একবার যা চেয়েছ তাছাড়া কখনও আর অন্য কিছু চাইবে না। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে আপনার সৃষ্টিকূলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য করবেন না। তখন আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা, তোমাকে যদি এ সমস্ত কিছু দেওয়া হয় তাহ'লে কি অন্য আর কিছু চাইবে? সে বলবে, না। আপনার সম্মানের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। সে আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন তাকে জান্নাতের দরজার কাছে নিয়ে আসা হবে। এসময় সে তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে এবং আল্লাহ যতক্ষণ চুপ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ বলবেন, আফসোস হে আদম সন্তান! তুমি সাংঘাতিক ওয়াদা ভঙ্গকারী। তুমি কি এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমি যা কিছু দিব, তাছাড়া অন্য আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে দুর্ভাগা করবেন না। এই বলে সে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। এমনকি তার এ মিনতি দেখে আল্লাহ হেসে উঠবেন। যখন তিনি হেসে ফেলবেন তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বলবেন, এবার চাও তোমার যা চাওয়ার আছে। তখন সে আল্লাহ্র কাছে মন খুলে চাইবে। এমনকি যখন তার আকাংখা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা চাও, ওটা চাও। এমনকি সে আকাংখাও যখন শেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, এ সমস্ত কিছুই তোমাকে দেওয়া হ'ল। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে- আল্লাহ বলবেন, যাও তোমাকে এ সমস্ত কিছু তো দিলাম, এর সঙ্গে আরও দশগুণ পরিমাণ দিলাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪৩)*।

আল্লাহ্র প্রতি যথার্থ ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি তার পাপের কারণে জাহান্নামে গেলেও কোন এক সময় আল্লাহ স্বীয় রহমতে মুমিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনয়ন করা এবং যথাসাধ্য আমলে ছালেহ করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

কালো টাকার উপহার

আমীন অনার্স-মাষ্টার্স পাশ একজন টগবগে যুবক। অন্যান্য ছেলেদের মতো তাকে চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে হাঁটতে হয়নি বেশী দিন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ছয় মাসের মধ্যে চাকরি জুটে গেল। খুব ভাল চাকরি। বড় অফিসার পদে। বেতনও বেশ ভাল। কিন্তু পরিশ্রমটা একটু বেশী। সেই সকাল ৮-টা থেকে রাত ৮-টা পর্যন্ত।

স্বতঃস্ফূর্ততা, কর্মচাঞ্চল্য ও সৃজনশীল চিন্তাধারা দিয়ে সে অল্প সময়ের মধ্যে অফিসের ছোট-বড় সবার মন জয় করে ফেলে। সে অফিসের কাজে খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক। তার হাযিরা খাতায় কোনদিন লালকালির দাগ পড়েনি।

পানির স্রোতের মতো দিন বয়ে চলল। ইতিমধ্যে চাকরি জীবনে তার পঞ্চম বছরে পদার্পণ। সফলতার সাথে এ বছরটা চোখের পলকে কেটে গেল। ষষ্ঠ বছর চলছে। সেদিনটির কথা আজো তার ভাল স্মরণ আছে। ভুলে যাবে কি করে? দিনটি ছিল সোমবার। সকাল ৭-টায় ঘুম ভাঙ্গলো। জানালা দিয়ে বাইরে সোনাঝরা রোদ্দুর চারিদিকে ঝলমল করছে। দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে কোন এক অজানা আনন্দে নিজে নিজে হাসল আমীন। তারপর গোসলের জন্য বাথরুমে ঢুকে সাবান-শ্যাম্পু মেখে খুব ভাল করে গোসল করল। মিনিট দশেক ব্যয় হ'ল তাতে। এবার চিরুণী নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। আয়নায় চোখ পড়তেই ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। হৃদপিণ্ডটায় যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। হাতুড়ী পেটানোর শব্দ যেন সে নিজের কানেও শুনতে পাচ্ছে। নিজের অজান্তেই আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে। আয়নার কাছ থেকে ৭-৮ পা পিছিয়ে আসল সে। তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল। মনে হ'ল শরীরের শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ভূত দেখার মত মনে হ'ল। সেকি! তাজ্জব ব্যাপার।

নির্বাক পাথরের মত কত সময় দাঁড়িয়ে ছিল সে তা বলতে পারবে না। নিজের মধ্যে শক্তি-সাহস সঞ্চয় করে এক পা দু'পা করে আয়নার খুব কাছে চলে গেল সে। হাত দিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল। তাইতো নাক গেল কোথায়? হাওয়া হয়ে গেল নাকি? সে মনে করল যেন গত রাতে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে তো রক্তের দাগ থাকবে। তাও তো নেই। তাকে কত বীভৎস দেখাচ্ছে। কিন্তু এমন তো হবার কথা ছিল না।

এতক্ষণে নিজেকে সে আবিষ্কার করল। সমস্ত শরীরে শীতের বরফ জমা বিশাল পাহাড়। শরীর এত ভারী মনে হ'ল যে পা তোলার ক্ষমতা নেই। অস্বস্থিতে ছটফট করতে লাগল। সোজা চলে গেল জানালার পাশে। রাস্তায় ভ্রাম্যমান সবারই তো নাক ঠিক জায়গায় আছে। তাহ'লে তারটা গেল কোথায়?

মেঘাচ্ছন্ন মুখ-চোখে কষ্টের লোনা জল নিয়ে আমীন একবার খাটের উপর বসছে আবার উঠে আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছে। নিজেকে তার খুব অসহায় মনে হ'ল। এমন ভয়ংকর ঘটনা দেখা তো দূরের কথা পত্র-পত্রিকায়ও তো কোনদিন পড়েনি সে। অস্থির ছটফটানিতে কেটে যাচ্ছে সময়। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। সকাল সাড়ে দশটা। খাটের উপর নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিল সে। তাও অস্বস্তি লাগছে তার। হঠাৎ তার বাড়ীর কথা মনে পড়ল। মা-বাবা, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন, কত বন্ধু-বান্ধব ওদের সামনে সে এ অবস্থায় কিভাবে দাঁড়াবে? ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে যাচ্ছে। হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠলো। কিছুই ভাবতে পারছে না। মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে। চিন্তায় কাতর হয়ে পড়ল আমীন।

গত দু'দিন আগে আমীনের কাছে আসাদ ছাহেব এসেছিলেন একটা যরূরী কাজে। তার সমস্ত কিছু শুনল। ঘাড় নেড়ে আসাদ ছাহেবকে বলল, ব্যাপারটা বড় গুরুতর। তিনি পাশে এসে হাত ধরে বললেন, ভাই আমাকে উদ্ধার করেন নইলে...? গম্ভীর কণ্ঠে বলল, পনের হাযার টাকা দিতে হবে। টাকার অংকটা শুনে তার চোখ ছানাবড়া। তিনি একটু কম দিতে চাইলেন। আমীন একেবারে না করল। অবশেষে কি আর করা? পুরো টাকাটাই দিয়ে গেলেন আসাদ ছাহেব। টাকাগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে আলমারির মধ্যে তালাবদ্ধ করল আমীন। মনের ভিতরে অনাবিল আনন্দ বয়ে যেতে লাগল তার।

সেদিনের কথা আজ শুয়ে চিন্তা করছে, এটা নিশ্চয়ই তার পাপের প্রতিফল। এমন নাজুক অবস্থায় মনুষ্য সমাজে বাস করা সম্ভব নয়। লজ্জায় মুষড়ে পড়ল সে। জীবন থেকে সে পালিয়ে বাঁচার সিদ্ধান্ত নিল। আজ রাতই হবে তার জীবনের শেষ রাত। ঘড়ির দিকে তাকাল। সন্ধ্যা ৬-টা। আবারও আয়নার কাছে গেল। সিদ্ধান্ত নিল আগে এই পাপের টাকাগুলো ফিরিয়ে দেবে, তারপর দুনিয়ার মায়াজাল ত্যাগ করবে।

তড়িৎ গতিতে উঠে হাত মুখ ধুয়ে প্যান্ট-শার্ট পরে নিল। পাপের টাকাগুলো আলমারি থেকে বের করে থলে ভর্তি করল। বড় একখানা রুমাল মুখ বরাবর চেপে ধরে বের হ'ল। একটি রিক্সা ডেকে সরাসরি আসাদ ছাহেবের বাসার দিকে ছুটল। গিয়ে টাকার ব্যাগটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে চলে আসল আমীন। আসাদ ছাহেব মূর্তির মত তাকিয়ে রইল। কিছু বলতে গেল কিন্তু...? রিক্সায় আবার চেপে বসল আমীন। রিক্সা আপন গতিতে চলছে। মনের মধ্যে প্রশ্ন উদয় হ'ল সবাই তো বেশ সুখেই চলছে। কিন্তু আমার একি হ'ল? পৃথিবী ছেড়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তটি চারিদিকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে সে। আল্লাহর সৃষ্টি পৃথিবী কতই না সুন্দর। নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। নিজের জীবনের জন্য একটু দুঃখিত হ'ল।

সামনে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে তার বাসা। রুমালের ভিতরে শক্ত অনুভূতি টের পেল। ছলকে উঠলো বুকের রক্ত। চমকে উঠল সে আবার কি হ'ল? ভয় পেল কিছুটা। ভয়ে চুপচাপ বসে আছে। বুকের ভিতরে কি যেন অনুভূতি জোরে জোরে লাফাচ্ছে। রিক্সা তার বাসার সামনে রাখল। রিক্সা ওয়ালাকে ভাড়া দ্বিগুণ দিল। ড্রাইভার তার দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকল।

সোজা রুমে ঢুকে দরজার ছিটকিনী আটকে দিল আমীন। আয়নার সামনে গিয়ে ভয়ে ভয়ে রুমাল সরাল। দেখেই আনন্দে নেচে উঠল তার মন, চিৎকার দিয়ে উঠল সে। এবার নাকতো ঠিক জায়গায়ই আছে। সে নিখুঁতভাবে দেখতে লাগল। ঠিক জায়গায়ই তো নাক আছে। পরম সুখে চোখের কোণে অশ্রু এসে গেল। মনে পড়লো তার আজ সোমবার। বৃহস্পতি ও সোমবার তওবা কবুলের দিন। তাই সে তওবা করল। আর নয় পাপের পথে উপার্জিত টাকার লোভ। এখন থেকে হালাল পথে উপার্জন করব; সৎ ও সুন্দরভাবে বাঁচবো। এটা আমীনের দৃঢ় সংকল্প।

এম. মুয়াযযাম বিল্লাহ
কাকডাঙ্গা সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা, সাতক্ষীরা।

চিকিৎসা জগৎ

হাঁটুর ক্ষয় রোগ

ক্ষয়ে যাওয়া হাঁটু নিয়ে সমস্যায় পড়েন অনেকে। বর্তমানে কৃত্রিম জানু প্রযুক্তি ও সার্জিক্যাল কৌশলের উন্নতিতে প্রতিস্থাপন এখন অনেক বেশি কার্যকর হচ্ছে। এ প্রযুক্তি শুরু হয়েছে ২০ বছর বা এরও বেশী পূর্বে। তবু ডাক্তাররা এখনো প্রতিস্থাপনের রোগীদেরকে অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছেন। ফলে অনেক রোগী তাদের জানুসন্ধির কোমলাস্থি পুরোপুরি ক্ষয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকেন। এভাবে তারা গৃহবন্দী হয়ে পড়েন, জানুতে প্রচুর ব্যথা নিয়ে হয়ে পড়েন শয্যাশায়ী। সমস্যা হ'ল, যে রোগীরা অনেক দিন অপেক্ষা করেন, তারা এত রুগ্ন হয়ে পড়েন যে, সেরে উঠা কঠিন হয়ে পড়ে। হাঁটুর কার্যক্ষমতা ফিরে পাওয়াও সম্ভব হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের দেলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওথেরাপি বিভাগের অধ্যাপক লিন স্নাইডার বলেন, 'খুব দীর্ঘসময় অপেক্ষা করলে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়ে যায়, যেখান থেকে ফেরত আসার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে যেতে থাকে। উন্নত দেশের পরিসংখ্যান মতে, পূর্ণবয়স্ক পাঁচ জনের মধ্যে একজনের থাকে আথ্রাইটিস বা হাড়ের গিঁটের ক্রনিক ব্যথা। মানুষের বয়স যত বাড়ে, ততই কোমলাস্থি ক্ষয়ে যেতে থাকে। ফলে প্রদাহ হওয়াতে ফোলা হয়, ব্যথা হয় এবং নিশ্চল হয় সন্ধি। বিশেষ চাকুরী বা এমন কোন ক্রীড়া যার জন্য বিশেষ হাড়ের গিটে পুনঃপুনঃ সঞ্চালণ ঘটে, এতে সেই হাড়ের গিঁটে হয় আথ্রাইটিস। পারিবারিক ইতিহাস ও ওযন বৃদ্ধিরও ভূমিকা রয়েছে এখানে। তবে আথ্রাইটিস সূচিত হ'লেই হাড়ের গিটের প্রতিস্থাপন অবশ্যম্ভাবী হয় না। ব্যথা ও প্রদাহের চিকিৎসা আশানুরূপ হ'লে কর্মক্ষমতা দীর্ঘদিন থাকে। ব্যথার ওষুধ এবং গ্লুকোস্যামাইন ও কনড্রায়াটিন এর মত সাপ্লিমেন্ট দিলে উপশম হয়। স্বাস্থ্যকর ওযন বজায় রাখলে জানুতে আথ্রাইটিসের ঝুঁকি কমে যায়। মাঝারি ধরনের ব্যায়ামে কিছু কাজ হয়। সার্জারির ব্যাপারে পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি দিন অপেক্ষা করেন। হয়ত দুর্বল হয়ে যাওয়া হাড়ের সীমারেখা একা গ্রহণ করতে পারেন বেশিক্ষণ। জার্নাল অব বোন অ্যান্ড জয়েন্ট সার্জারিতে ২০০৯ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে ডাঃ স্নাইডার ম্যাকলেরার ও সহকর্মীরা ৯৫ জন পুরুষ ও ১২৬ জন নারীর উপর গবেষণা করেন। এদের জানু প্রতিস্থাপনের কথা জানান। দেখা যায়, পুরুষদের তুলনায় নারীদের সার্জারি বেছে নেয়ার প্রস্তুতির সময় শারীরিক অবস্থা ও হাড়ের গিটের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। গত বছরের গোড়ার দিকে ক্যানাডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন জার্নালে রিপোর্টে দেখা যায়, ডাক্তাররা নারীদের চেয়ে পুরুষদের অনেক বেশি বার সার্জারির পরামর্শ দিয়েছিলেন। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একজন পুরুষ ও একজন নারী বেছে নিলেন, দুজনেরই বয়স ৬৭ বছর। যাদের জানুতে ওস্টিওআথ্রাইটিস ছিল একই মাপের। এদের প্রত্যেকে ২৯ জন অর্থোপেডিক সার্জন ও ৩৮ জন পারিবারিক চিকিৎসকের কাছে ভিন্নভাবে গেলেন। যদিও তারা উভয়েই একই রকম উপসর্গের কথা বললেন। তবুও দুই-তৃতীয়াংশ চিকিৎসক পুরুষকে দিলেন জানু প্রতিস্থাপনের পরামর্শ, অথচ কেবল একতৃতীয়াংশ মনে করেন যে নারীদের জন্যও এটি প্রয়োজ্য। ভিনদেশী ষাটোর্ধ একজন মহিলার বক্তব্য, বছরের পর বছর যন্ত্রণা ভোগের পর তার চিকিৎসক তাকে জানু প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিলেন। তিনি জানান, সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ার পরও চিকিৎসকরা এ ব্যাপারে মত দিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

চিনি কম খান

চিনি থেকে বিপদ : বেশী মিষ্টি খেলে ওযন বাড়ে। চিনিতে ব্যাপক পরিমাণে কেলরি থাকে। মিষ্টি জিনিসে চর্বিও বেশী থাকে। চিনিতে কোনও ভিটামিন, মিনারেল বা পৌস্টিক তত্ত্ব থাকে না। তাই শুরু থেকেই কম করে মিষ্টি খেতে হয়। বয়স বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে মিষ্টি জিনিসের প্রতি দুর্বলতাও বেড়ে যায়। তখন বেশী করে চিনি খেলেও তাদের জিভে লাগে না।

কতটুকু চিনি খাওয়া দরকার : কোন স্বাস্থ্যবান যুবক ১৬০০ কেলরিযুক্ত আহার গ্রহণ করলে সে ৬ চামচ অর্থাৎ ২৪ গ্রাম চিনি খেতে পারে। অন্যদিকে ২,২০০ কেলরিযুক্ত আহার গ্রহণ করা ব্যক্তির ১২ চামচ অর্থাৎ ৪৮ গ্রাম চিনি খাওয়া প্রয়োজন।

মিষ্টি খাওয়াটা নিয়ন্ত্রণে রাখুন : ফলের রস, আইসক্রিম ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের শরীরে যে পরিমাণ চিনি প্রবেশ করে, সেটা সুগারের মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এর ফলে শরীরে অবশ ভাব নেমে আসে।

* লেবুর পানি, চা, কফি ইত্যাদিতে চিনির পরিবর্তে মধু খাওয়া প্রয়োজন।

* মিষ্টি খেতে মন চাইলে মিষ্টির পরিবর্তে ফল খেতে হবে।

* প্রতিদিন পাঁচ থেকে ছয় চামচের বেশী চিনি খাওয়া ঠিক নয়।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

কোয়েল পালনে স্বাবলম্বী

দিনাজপুরের পার্বতীপুর শহরের এক শিক্ষিত যুবক কামরুল হুদা ১৯৯৫ সালে পার্বতীপুর ডিগ্রী কলেজ থেকে বিএ পাস করে জড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন ব্যবসার সাথে। এর মাঝে তার মনে জাগে কোয়েল পাখী পালনের সখ। এক সময় সখ করে কোয়েল পালন করলেও পরবর্তীতে তিনি বুঝতে পারেন যে, এটা একটি লাভজনক ব্যবসা। অল্প জায়গায় কম খরচে বেশী লাভ করার সুযোগ রয়েছে এ ব্যবসায়। তখন থেকেই বাণিজ্যিকভাবে তিনি কোয়েল পালন শুরু করেন। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিজ বাড়ীতে মাত্র ৩৫০টি কোয়েল নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। ২০০৯ সালে জানুয়ারী মাসে পার্বতীপুর শহরের পুরাতন বাজার এলাকার পরিত্যাক্ত সাগর সিনেমা হল ভবনে কোয়েল পাখীর ফার্ম ও হ্যাচারি গড়ে তোলেন। এই ফার্ম ও হ্যাচারি করে সেখানকার আয় দিয়ে তার সংসার চালিয়েও অর্থ গচ্ছিত করতে পারছেন।

এক সময় ৩৫০টি কোয়েল পাখী দিয়ে এ ফার্মের যাত্রা শুরু হ'লেও বর্তমানে এ ফার্মে ৬ হাযার কোয়েল পাখী রয়েছে। প্রতিমাসে কোয়েল পাখী ও ডিম বিক্রি করে যে আয় হয় তা দিয়ে তার ৪ সদস্যের সংসার ভালভাবে চলা ছাড়াও একটা মোটা অংকের টাকা গচ্ছিত রাখা সম্ভব হচ্ছে। এখন এ ফার্মে একদিন বয়সের কোয়েল পাখী থেকে শুরু করে ডিম পাড়া ও গোশত খাওয়া পাখী পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। একদিনের বাচ্চার মূল্য ১০ টাকা এবং বড়পাখীর মূল্য ৩০ টাকা। একশ'টি কোয়েল পাখীর ডিম ১৮০ টাকা থেকে ১৯০ টাকা দরে বিক্রি হয়ে থাকে। অন্য সব পশু পাখীর চেয়ে কোয়েল পাখী পালনে খরচ কম হ'লেও আয় বেশী। আর এ পাখী পালনে বেশী জায়গারও প্রয়োজন হয় না। একটি বড় কোয়েল পাখী মাসে ২ কেজি খাবার খায়। অথচ ডিম দেয় মাসে ২৫ থেকে ২৮টি। এই পাখীর কোন রোগ বালাই নেই বলে বাড়তী ওষুধ পত্রেরও প্রয়োজন হয় না। তাছাড়াও এই পাখীর ডিম ও গোশতের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তার এই ফার্মে তিনি নিজে পাখী পরিচর্যা করার পাশাপাশি আরও দু'জন বেতনভুক্ত কর্মচারী রেখেছেন এগুলো দেখাশোনার জন্য। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও সরকারী সাহায্য-সহযোগিতা পেলে বিদেশে কোয়েল পাখীর গোশত রপ্তানি করা যাবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকেরা লেখাপড়া শিখে চাকুরী পাওয়ার আশায় ছুটাছুটি করে বেড়ান। অথচ অল্প জায়গায় সামান্য পুঁজিতে কোয়েল পাখী পালন করে তারা সহজেই স্বাবলম্বী হ'তে পারেন।

স্বল্প শ্রমে অধিক লাভ

আর্থিকভাবে লাভজনক ও অবিশ্বাস্য মাত্রায় পুষ্টির আধার হচ্ছে গ্রাম-বাংলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সজনে গাছ। সজনে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় এবং এর ফুল, বীজ, পাতা, ছাল, আঠা, শিকড় ইত্যাদি যাবতীয় পুষ্টির আধার ও সাধারণ রোগ নিরাময়ে খুবই কার্যকরী। এখন সজনের পুরো মৌসুম। বাড়তি খরচ ছাড়াই খুব কম যত্ন আর অল্প শ্রমে বেড়ে ওঠা একটি বড় আকারের সজনে গাছ থেকে ১২ থেকে ১৫ মণ ডাঁটা সংগ্রহ করা যায়। বাজারে যখন সজনে ডাঁটার প্রথম আমদানি ঘটে তখন প্রতিকেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হয়। আমদানি বৃদ্ধির সাথে প্রতিকেজির মূল্য ১৫ থেকে ২০ টাকায় দাঁড়ায়। এ হিসাবে প্রতিটি গাছ থেকে ৯ হাযার ৬শ' থেকে ১২ হাযার টাকার সজনে ডাঁটা বিক্রি করা যায়। সরাসরি বীজ থেকে আবার গাছের ডাল পুঁতে সহজেই এ গাছ রোপণ করা যায়। তেমন খরচ ছাড়াই সামান্য যত্ন আর পরিশ্রমের উদ্যোগ নিলেই প্রতি পরিবারেই আসতে পারে মোটা অংকের বাড়তি আয়। এদিকে এ গাছটির গুণাগুণ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, তাজা সজনে পাতায় রয়েছে গাজরের চেয়ে ২ গুণ বেশী ভিটামিন-এ, কমলা লেবুর চেয়ে ৭ গুণ বেশী ভিটামিন-সি, কলার চেয়ে ৩ গুণ বেশী পটাশিয়াম, দইয়ের চেয়ে ২ গুণ বেশী প্রোটিন, দুধের চেয়ে ৪ গুণ বেশী ক্যালসিয়াম ও পালংশাকের চেয়ে ৩-৪ ভাগ বেশী আয়রণ। শুকনো সজনে পাতায় রয়েছে গাজরের চেয়ে ১০ গুণ বেশী ভিটামিন-এ, কমলার অর্ধেক ভিটামিন-সি, কলার চেয়ে ১৫ গুণ বেশী পটাশিয়াম, দইয়ের চেয়ে ৯ গুণ বেশী প্রোটিন, দুধের চেয়ে ১৭ গুণ বেশী ক্যালসিয়াম ও পালংশাকের চেয়ে ২৫ গুণ বেশী আয়রণ। সজনে পাতায় আর যেসব ভিটামিন, খনিজ বা খাদ্যপ্রাণ রয়েছে সেগুলো হ'ল ভিটামিন-এ, ভিটামিন বি-১, বি-২, বি-৩, ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম, ক্রোমিয়াম, কপার, আয়রণ, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস, পটাসিয়াম, প্রোটিন ও জিংক। এছাড়া সজনে গাছের প্রতিটি অংশই উপকারী। এ গাছের পাতা-ডাঁটা পুষ্টি ও ওষুধ হিসাবে এবং ফুল, ছাল, আঠা ও শেকড় ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সজনের বীজ পানি পরিশোধনকারী, রান্নার তেল ও প্রসাধনী কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রতিদিন ৮ থেকে ২৪ গ্রাম সজনে পাতা খেলে স্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। তরকারীর সাথে রান্না করে, তাজা অথবা শুকনো সজনে পাতা যে কোন খাবারের সাথে খাওয়া যায়। এর পাতা শুকিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণে রেখেও সারাবছর তরকারীর সাথে খাওয়া যায়। সজনে পাতা শুকিয়ে অথবা কাঁচা অবস্থায় এবং ডাঁটা তরকারীর সাথে নিয়মিত খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শরীর সুন্দর ও মযবুত হয়। গবাদিপশুর জন্যও সজনে পাতা এক আদর্শ খাবার। সজনে পাতা গবাদিপশুকে নিয়মিত খাওয়ালে দুধ ও গোশত দু'টোই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সজনে পাতা শুকনো অথবা কাঁচা উভয়ভাবেই গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায় সারা বছর। সজনের বাগান করা খুবই সহজ। তুলনামূলক অনুর্বর জমিতে স্বল্প স্থানেই এ গাছ রোপণ করা যায়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

পথিক

মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান
পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী।

পথিক তুমি ক্ষান্ত কেন চল পুনর্বার,
নইলে হারিবে ভবে দেখিবে আঁধার।
গোলাপ ছিড়িতে গেলে হাতে বিধে কাঁটা
স্বপ্নের দ্বার নয়ত খোলা সে যে তালা আঁটা।
বন্ধুর পথে কেন পাবে মনে ভয়,
দেখেছ কষ্ট বিনা আসে কার জয়?
পিপিলিকা অন্নের তরে দিন রাত ঘুরে,
চিল দেখ সুখের জন্য উঠে কত দূরে?
পানকৌড়ি জলে ডুবে মিটায় মনের আশা,
দেখনি কেমনে বাঁধে বাবুই তার বাসা?
তুমিতো মানব জাতি সবাই তোমায় মানে,
কেন তুমি ভীত হয়ে রবে ঘরের কোণে?
হস্ত-পদ শক্ত কর মনে কর বল,
দেখিবে সবই সহজ সবই সমতল।

জিহাদের প্রয়োজন

আশরাফুল হক
মোহনপুর, রাজশাহী।

পৃথিবীতে নেমে এসেছে আঁধার ডুবে গেছে আফতাব
আকাশে সিতারা ম্রিয়মান ওঠে না আলোর চাঁদ।
যুগের দিশারী ঘুমেতে বিভোর জাগিবার নেই ভাব
কিসের কারণে আজ এ হতাশা কি কারণে অবসাদ?
ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগর হুঁশিয়ার কাণ্ডারী!
পাহাড় সমান উর্মিমালা, হাঙ্গর-কুমির কত,
মেলেছে থাবা গ্রাসিতে তোমায় দুর্যোগ হয়েছে ভারি
এ তুফান কালে দিতে হবে পাড়ি সিন্দাবাদের মতো।
দিনের আলোক আবার ফুটিবে কেটে যাবে মেঘ-ঝড়
ঘুম ভেঙ্গে সব জেগে ওঠো আজ, জাগো জাগো ভাই-বোন,
সম্মুখে রয়েছে বিপুল আশার স্বপ্ন-জীবনভর
জীবন এবং দ্বীনের জন্য জিহাদের প্রয়োজন।
কেউ কি আছো এই সংকটে ধরিতে ন্যায়ের হাল,
জাতীয় জীবনে যুগের দিশারী হয়ে রইতে চিরকাল?

তওবা

মুমিনুল ইসলাম
নামাযগড় মাদরাসা, নওগাঁ।

জানি হে প্রভু! তোমার নাম রহীম ও রহমান,
ক্ষমা করে ক্বিয়ামতে রেখ আমার মান।
অসংখ্য লোকের মাঝে করো না আমায় অপমান,
ডান হাতে আমলনামা দিয়ে ক্ষমার দিও প্রমাণ।
যেখানে থাকবে প্রথম হ'তে শেষ নবীর অনুসারী,
পাপ পুণ্য মাপার সময় পুণ্যের পাল্লাটা করিও ভারী।
জানার পরেও যুলুম ও অন্যায় করছি নিজের উপর,
ক্ষমার আশায় আজ ভরসা করি শুধু তোমারই উপর।
তোমার ক্ষমা না পেয়ে আমি কোন দরবারে ঘুরি,
তুমি ছাড়া নেই কোন প্রভু তাই তোমায় সদা স্মরি।
তোমার ক্ষমা পেলে হবে না কেউ জাহান্নামী কভু,
তাই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও হে দয়াময় প্রভু!
জানি আমার পাপ হয়েছে পর্বত পরিমাণ,
তবু এও জানি তোমার দয়া অসীম অফুরান।
শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছিলাম,
তোমার শাস্তির কথা মনে হয়ে পুনরায় ফিরে এলাম।
যাব না আর কখনও সেই কাজে তোমায় কথা দিলাম
তোমার কাছে তওবা করে অন্তরে প্রশান্তি পেলাম।

স্রষ্টার অস্তিত্ব

ক্বামারুযযামান
হারাগাছ, রংপুর।

মাশরিকের ঐ দিগন্তে ওঠে নবারুণ,
অস্ত যায় সন্ধ্যাবেলা কার কুদরতের দরুণ।
চারদিকে আসমান সাদা মেঘের ভেলা,
কোন সে কবির অতুল ছবি নিখুঁতভাবে আঁকা।
অপরূপ সৃজন তোমার করছে তাসবীহ গুণগান,
অশ্রু ঝরে তোমার ভয়ে তুমিই স্রষ্টা মহান।
অবিনশ্বর এক, তুমি যে রিযিকদাতা,
তুমি যে অস্তিত্বশীল জানে না অনেক মানব ভ্রাতা
নিদর্শন তোমার ছড়িয়ে আছে এই ধরণীর বুকে,
বিবেক থাকার পরেও যে না বুঝে,
ব্যর্থ তার এ জনম এসে ধরা মাঝে।

প্রভুর গুণগান

এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কার ইশারায় চন্দ্রতারা
দিচ্ছে রাতে কিরণ
কাল মহাকাল এই ধরাতে
কেউ করেনি বারণ।
ছুবহে ছাদিক শেষ হ'ল
মুওয়াযযিনের আহ্বানে,
মুক্ত গগন ভোরের আলোয়
হরেক পাখির কলতানে।
শিশির কণা ঘাসের ডগায়
সদ্য স্নান করে,
লক্ষ বছর বেঁচে আছে
বংশ বিস্তার করে।
জিন-দানবের ভয় কাটিয়ে
রাত্রি হ'ল শেষ,
সোনার রবির পরশ পেয়ে
আলোকিত দেশ।
দেশ দেশান্তর চির সবুজ
ফসল ঘেরা মাঠ,
আল্লাহ তোমার সৃষ্টি সবি
বিশ্ব ভবের হাট।
ক্ষুধা মুক্ত দারিদ্র মুক্ত
গড় সফল দেশ,
তোমার গুণগান শুকরিয়া প্রভু
হবে নাকো শেষ।
ফুল ফুটল সুবাস দিতে
ফল হ'ল তাতে
আল্লাহ তোমার সৃষ্টি সবি
যা আছে জগতে।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। মানবজাতি। ২। সূরা বারআত ও সূরা নামল।
৩। মারিয়াম। ৪। যায়েদ (রাঃ)-এর।
৫। আয়েশা (রাঃ); সূরা নূর।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। তাল ২। কাতার। ৩। কাঠ।
৪। বাবা, ছেলে ও পৌত্র। ৫। ময়দান।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

(১) উপমহাদেশে 'বাবুল ইসলাম' কাকে বলা হয়?
(২) সমগ্র মানবজাতির পিতৃভূমি কাকে বলে?
(৩) 'বাবুল মক্কা' কাকে বলে?
(৪) ভারতের গুজরাটকে কেন 'বাবুল মক্কা' বলা হয়?
(৫) বাংলাদেশে 'বাবুল ইসলাম' কাকে বলে?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

যাদু নয় বিজ্ঞান

হিজরী সনকে খৃষ্টাব্দে রূপান্তর করার কৌশল :

১. প্রথমে হিজরী সনকে ৩৩ দিয়ে ভাগ করে শুধু ভাগফলটি গ্রহণ করবে (ভাগশেষের চিন্তা করবে না)।
২. এরপর হিজরী সন থেকে ভাগফলটি বিয়োগ করবে।
৩. সবশেষে বিয়োগফলের সাথে ৬২২ (মহানবীর মদীনা হিজরতের বর্ষ) যোগ করবে। সর্বশেষ এই যোগফলটিই হবে কাঙ্খিত খৃষ্টাব্দ বা ইংরেজী সাল।

যেমন ১৪৩৫ হিজরীতে খ্রীষ্টীয় সন কত হবে? উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী-

(ক) ১৪৩৫ ÷ ৩৩ = ৪৩ (এখানে ভাগশেষ ১৬ ধর্তব্য নয়)।
(খ) ১৪৩৫-৪৩ =১৩৯২
(গ) ১৩৯২+৬২২= ২০১৪

এই যোগফল তথা ২০১৪ই হ'ল কাঙ্খিত খৃষ্টাব্দ। এভাবে পূর্বের সালও বের করা যাবে। সোনামণিরা চেষ্টা করে দেখ।

সংগ্রহে : আব্দুর রশীদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

ডাকবাংলা, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর ২০ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদস্থ সোনামণি যেলা কার্যালয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও সোনামণি যেলা উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মুখতারুল ইসলাম, সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে হাফেয আনোয়ার হোসেনকে পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' যেলা পরিচালক হাফেয আনোয়ার হোসেন।

টাকা

শামসুয্যোহা ফাহাদ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

টাকা থাকলে থাকে মান,
টাকা না থাকলে অসম্মান।
টাকাই জীবন টাকাই মরণ,
টাকার জন্য মৃত্যুবরণ।
সবার মূলে থাকে টাকা,
টাকা না থাকলে জীবন ফাঁকা।
পৃথিবী ঘুরে সূর্যের পিছে,
মানুষ ঘুরে টাকার পিছে।
টাকাই সব কিছুর মূল,
টাকার জন্য মানুষ খুন।
টাকা থাকলে সুখ মিলে,
জীবনটা যায় হেসে খেলে।
অর্থ অনর্থের মূল
এ কথা জানা চাই,
হারাম পথে করলে কামাই
জাহান্নামে হবে ঠাই।

***

শুভেচ্ছা রাশি রাশি

আরীফুল ইসলাম
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

ছোট্ট একটি বিভাগ তবু
ব্যাপক তার কর্ম,
যে পড়ে সেই জানে
এ বিভাগটির মর্ম।
সোনামণি নামটি সদা
আত-তাহরীকে রয়
এ পত্রিকা পড়ে অনেকে
ভাল মানুষ হয়।
জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরা থাকে
আত-তাহরীকের পাতা
আরো থাকে অনেক অনেক
হিদায়াতের কথা।
তাহরীক পরিবারকে তাই
শুভেচ্ছা রাশি রাশি,
আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি
প্রচার হোক বেশী।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বিয়ে-শাদীতে সন্তানের ধর্ম পরিচয় বাদ

বিয়ে-শাদী থেকে ধর্মকে বিতাড়ন করা হয়েছে বিশেষ বিবাহ আইনে। এর ফলে বিয়েতে সন্তানের কোন ধর্ম পরিচয় থাকবে না। এ 'বিশেষ বিবাহ আইন ১৯৭২' বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সংশোধন করা হয়। নতুন সংশোধনী 'বিশেষ বিবাহ আইন ২০০৭' নামে বর্তমান সংসদে পাস হয়ে আইনে রূপান্তরিত হওয়ায় এখন বিয়ে-শাদী থেকে ধর্ম বাদ পড়েছে। ইসলামী শরী'আতে এভাবে বিয়ে শুদ্ধ ও জায়েয না হ'লেও আইনত এ ধরনের বিয়ে সংঘটিত হচ্ছে। হিন্দু ধর্মমতেও এভাবে বিয়ে বৈধ নয়। এই আইন অনুযায়ী একজন মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদী কিংবা অন্য যেকোন ধর্মের যে কেউ যে কাউকে বিয়ে করতে পারবে। পাত্র-পাত্রী একজনকেও ধর্মান্তরিত হতে হবে না। ধর্ম পরিবর্তন ছাড়াই তারা দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করতে পারবে। ইচ্ছে করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অথবা যেকোন একজন নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস বাদও দিতে পারে। এ ধরনের বিয়ের মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তানদের কোন ধর্মীয় পরিচয় থাকবে না। বড় হয়ে (১৮ বছর) তারা যেকোন ধর্ম বেছে নিতে পারবে অথবা ধর্ম বিশ্বাস ছাড়াই জীবন-যাপন করবে। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর এসব সন্তান যার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তার ধর্ম অনুযায়ী মীরাছ পাবে।

[ইসলামের বিরুদ্ধে এটি যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। আমরা সরকারকে এ থেকে সরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ; জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২ হাযার ২১২ জন

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হারে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০১২ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এবার গড় পাসের হার ৮৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ। গত বছরের চেয়ে পাসের এই হার ৪ দশমিক ০৬ ভাগ বেশি। গত বছরে পাসের হার ছিল ৮২ দশমিক ৩১ শতাংশ। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২ হাযার ২১২ জন। এই সংখ্যা গত বারের চেয়ে ৫ হাযার ৪৬৩ জন বেশি। গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের ১২তম বছরে পাসের হার অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙ্গেছে। এবার দাখিল পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮৮.৪৭ শতাংশ। যা গত বারের চেয়ে ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ বেশি। আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় এবার পাসের হার ৮০ দশমিক ৬৯ শতাংশ। মাদরাসা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩ হাযার ৪৩৬ জন এবং কারিগরি বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে তিন হাযার ৫২৪ জন।

[কেবল পাসের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সকলকে সেদিকে নযর দেবার আহ্বান জানাই (স.স.)]

গ্লোবাল পোষ্টের প্রতিবেদন

বিশ্বের নিকৃষ্ট হওয়ার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ভিন্ন ধারার সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল পোষ্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্ট হওয়ার প্রতিযোগিতায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত। এখানে শ্রমিকদের বেতন যেমন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম, তেমনি কর্ম পরিবেশও সবচেয়ে নিকৃষ্ট। সম্প্রতি প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকরা কম্বোডিয়ার গার্মেন্ট শ্রমিকদের অর্ধেকেরও কম এবং চীনের শ্রমিকদের এক চতুর্থাংশের কম বেতন পান।

[রক্তচোষা ধনিক শ্রেণীর উপরে খবরদারি করার কেউ নেই। কেননা বর্তমান নবম জাতীয় সংসদের ৮০ শতাংশ এমপি হ'ল ব্যবসায়ী। গরীবকে বাঁচিয়ে রেখে তার রক্ত শোষণ করাই এদের নেশা। ইসলামী শ্রমনীতি চালু করা ব্যতীত এর কোন বিকল্প নেই (স.স.)]

সংসদে প্রতি ঘণ্টার ৫৮ মিনিট ব্যয় হয় নেতার গুণকীর্তন ও প্রতিপক্ষের সমালোচনায়

-মেনন

সংসদের কার্যক্রমের ঘণ্টার ৫৮ মিনিট ব্যয় হয় দলীয় নেতার গুণকীর্তন ও প্রতিপক্ষের সমালোচনায় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদে গড়ে দুই মিনিট সময় সাধারণ মানুষের অধিকারের কথা বলা হয়। বাকী সময় এক দল অন্য দলের সমালোচনা করে এবং নেতাদের মহান কর্মের গুণকীর্তন করে আলোচনার মাধ্যমে। গত ৫মে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

[ধন্যবাদ মেননকে। এককালের বাম নেতা এখন খাসা পুঁজিবাদী। তাদের কথিত 'শুয়োরের খোয়াড়ের' তিনি নিজেও একজন সদস্য। অতএব নিজেকে সামলানোই ভাল হবে (স.স.)]

১০০ কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়েছে ডেসটিনি

ডেসটিনি গ্রুপের দু'টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ১০০ কোটি টাকার বেশি কর ফাঁকির প্রমাণ পেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। প্রতিষ্ঠান দু'টি হ'ল ডেসটিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেড ও ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড। এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, এর মধ্যে ডেসটিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন ৭৩ কোটি টাকার কর ফাঁকি দিয়েছে। এ কারণে গত ৮ মে প্রতিষ্ঠানটির সব ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। আর ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেডের বিরুদ্ধে ৩২ কোটি টাকার মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ফাঁকির তথ্য মিলেছে। এই তথ্য পেয়ে গত ৯ মে বুধবার প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ হুসাইনসহ পাঁচ শীর্ষ শেয়ারধারীর ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে এনবিআর। এনবিআরে জমা দেয়া এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণীর সঙ্গে ব্যাংক হিসাবে লেনদেনের এই গরমিল খুঁজে পায় এনবিআর। এনবিআর এখন ডেসটিনির অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের বিবরণী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। ইতিমধ্যে ডেসটিনি গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের রাজস্ব সংক্রান্ত অনিয়ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এনবিআরের সদস্য (নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদন্ত) মুহাম্মাদ আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

[দেশের রাঘব বোয়ালরা এদের সদস্য ও নীতিনির্ধারক। আমরা দশ বছর আগেই যার বিরুদ্ধে বলেছি সরকার এখন তার বিরুদ্ধে বলছে। তবে মনে হয় কেবল হাকডাক সার হবে। কারণ সরকার যে এ ব্যাপারে মোটেই আন্তরিক নয়, তা বুঝা গেছে (স.স.)]

দেশে পরোক্ষভাবে ৪ কোটি ২০ লাখ লোক ধূমপানের শিকার হচ্ছে

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে অনুসারে দেশে ৪ কোটি ২০ লাখ লোক পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হচ্ছে। এর মধ্যে ১ কোটি নারী। কর্মক্ষেত্রে শতকরা ৬৩ এবং পাবলিক প্লেসে ৪৫ ভাগ ধূমপানের শিকার। শুধু রেস্তোরাঁয় ২ কোটি ৫৮ লাখ মানুষ পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হচ্ছে। তামাক বা ধূমপানজনিত কারণে প্রতিবছর ৫৭ হাযার মানুষ মারা যাচ্ছে। পঙ্গুত্ব বরণ করছে প্রায় ৩ লাখ ৮২ হাযার মানুষ। ধূমপানের ধোঁয়ায় প্রায় ৭ হাযার ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যাল থাকে, যার মধ্যে ৬৯টি ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী।

[এত প্রচারের পরেও এযাবত কোন সরকারই এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ধূমপান নিষিদ্ধ করার মত সাহসী পদক্ষেপ নিতে গেলে সরকারের মন্ত্রী ও দলীয় নেতাদের আগে ধূমপান ছাড়তে হবে। তামাক চাষের বদলে খাদ্য-

শস্য চাষে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তা লাভজনক করতে হবে (স.স.)]

আফ্রিকার ভূ-গর্ভে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সুপেয় পানি সঞ্চিত রয়েছে

ভয়াবহ খরাপীড়িত মহাদেশ আফ্রিকার ভূ-গর্ভস্থ জলাধারগুলোতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সুপেয় পানি সঞ্চিত আছে বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের দাবি ভূ-গর্ভস্থ ঐসব জলাধারে ভূ-পৃষ্ঠে প্রাপ্ত সুপেয় পানির পরিমাণ থেকে শতগুণ বেশি পানি আছে। এনভায়রণমেন্টাল রিসার্চ লেটার সাময়িকীতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডন (ইউসিএল) ও যুক্তরাজ্যের জিওলজিক্যাল সার্ভে (বিজিএস)'র গবেষকরা এ দাবি করেছেন। ধারণা করা হয়, বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ সুপেয় পানি পাচ্ছেন না। এ মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং ফসলের সেচের জন্য পানির চাহিদা আগামী কয়েক দশকে ব্যাপকহারে বেড়ে যাবে। উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া, আলজেরিয়া ও চাদের ভূ-গর্ভে পাললিক শিলার বিশাল স্তরের মধ্যে সবচেয়ে বড় জলাধারগুলোর অবস্থান বলে জানান প্রকাশিত নিবন্ধের অন্যতম লেখক বিজিএস'র হেলেন বনসর। তিনি বলেন, ভূ-গর্ভস্থ ঐ পানির উৎস এখনো আমাদের দৃষ্টির বাইরে, তাই আমাদের মনেরও বাইরে। কিন্তু মানচিত্র তৈরি শেষ হ'লে উৎসগুলোর সম্ভাবনার বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি খুলে যাবে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল কাজে লাগিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে ঐ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা গেলে আফ্রিকার খরা ও সুপেয় পানির অভাব চিরতরে দূর হয়ে যাবে বলে দাবি করেন তিনি।

[এটাই আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা। তিনি বান্দার জন্য ভূপৃষ্ঠে, ভূগর্ভে ও নভোমণ্ডলে সর্বত্র রূযির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বান্দাকে কেবল খুঁজে বের করতে হবে এবং সবল-দুর্বল সকলকে বণ্টন করে দিয়ে পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে হবে (স.স.)]

শ্রীলংকায় মসজিদে বৌদ্ধদের হামলা

শ্রীলংকার মধ্যাঞ্চলে একটি মসজিদের উপর হামলার পর স্থানীয় মুসলমানরা শুক্রবারের ছালাতে যোগদান থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছেন। ডাম্বুলা শহরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে শ্রীলংকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রায় দু'হাযার মানুষ মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার দাবিতে মসজিদের বাইরে বিক্ষোভ করেছে। এ সময় মসজিদ থেকে সব মুছল্লীকে সরিয়ে নেয়া হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেখানে জুম'আর ছালাত আদায় করা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। মসজিদ লক্ষ্য করে গত ১৯ এপ্রিল রাতে পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়। এতে কেউ হতাহত হয়নি, তবে মসজিদের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। শ্রীলংকার বহু বৌদ্ধ মনে করে ডাম্বুলা তাদের জন্য পবিত্র শহর। দেশের ঐ অঞ্চলে বিগত কয়েক মাস ধরে ধর্মীয় উত্তেজনা চলছে।

[ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস দূর করাই হ'ল ইসলামী দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। সেকারণ ভ্রান্ত বিশ্বাসীরা ইসলামকে সহ্য করতে পারে না। এক্ষেত্রে ভারতে বাবরী মসজিদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের হামলা ও শ্রীলংকায় ডাম্বুলা মসজিদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের হামলার মধ্যে আক্বীদাগত কোন পার্থক্য নেই। উভয়ে ইসলামের শত্রু। তবে একজন কিছু একটা ধারণা করবে। আর একটি প্রতিষ্ঠিত মসজিদকে ভেঙ্গে ফেলবে ও মুসলমান বিতাড়িত করবে, এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। ঐদেশের সরকার প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিবেন, এটাই আমরা কামনা করি (স.স.)]

সুপ্রিম কোর্টের ওপর মার্কিন নাগরিকদের আস্থা সর্বনিম্নে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের ওপর দেশটির নাগরিকদের আস্থা এখন সর্বনিম্নে এসে ঠেকেছে। 'পিউ রিসার্চ সেন্টার' পরিচালিত এক নতুন জনমত জরিপে এ তথ্য জানা গেছে। জনমত জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, দেশটির শতকরা মাত্র ৫২ ভাগ মানুষ এখন সর্বোচ্চ আদালতের ওপর আস্থা রাখে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে জনমত জরিপ শুরুর পর গত ২৫ বছরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে কম জনসমর্থনের চিত্র। তিন বছর আগে সর্বোচ্চ আদালতের উপর আস্থা ছিল শতকরা ৬৪ ভাগ মানুষের। আর ১৯৯৪ সালে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ আস্থা ব্যক্ত করেছিল।

[সামনে আদৌ থাকবে কি-না সন্দেহ। কেননা যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল গণতান্ত্রিক দেশে দলতন্ত্রই প্রকট। আদালতগুলি তার ছোঁয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। এ থেকে বাঁচতে গেলে আইনজীবীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা আবশ্যক (স.স.)]

মন্দার মধ্যেও ব্রিটেনের ধনীরা আরো ধনী

অর্থনৈতিক মন্দা আরো ঘনীভূত হ'লেও গত বছর ব্রিটেনের ধনীরা আরো ধনী হয়েছেন। অনেক বিলিয়নিয়ার এবং মধ্যম মানের উদ্যোক্তাদের সম্পদ কমেনি বরং বেড়েছে। প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, ব্রিটেনে তালিকাভুক্ত শীর্ষ এক হাযার ধনীর মোট সম্পদ ৪১ হাযার ৪২৬ কোটি পাউন্ড। অর্থাৎ যা গতবারের তালিকাভুক্ত মোট এক হাযার ধনীর সম্পদের তুলনায় ৪ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। গতবার মোট সম্পদের অর্থমূল্য ছিল ৪১ হাযার ২৮৫ কোটি পাউন্ড। এবারের তালিকায় বিলিয়নিয়ার রয়েছে ৭৭ জন। ২০০৫-২০১১ সাল পর্যন্ত টানা আট বছর ব্রিটেনে শীর্ষ ধনীর অবস্থান ধরে রেখেছেন ভারতীয় ইস্পাত ব্যবসায়ী লক্ষ্মী মিত্তাল। তার সম্পদের মূল্যমান এক হাযার ২৭০ কোটি পাউন্ড।

[গাছতলা ও পাঁচতলার বিভক্তির নামই তো পুঁজিবাদী অর্থনীতি। মন্দা থাকা না থাকা এদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর অনেকটা নির্ভর করে। তাই মন্দা দরিদ্রকে নিঃস্ব করলেও এদের গায়ে খুব কমই আঁচড় লাগে। এদের সম্পদ ভেঙ্গে যাবে ও তা গরীবদের ঘরে যাবে, এই ভয়ে এরা ইসলামী অর্থনীতি চায় না। তাই সমাজদেহ শুকিয়ে এদের মাথাগুলিই কেবল মোটা হচ্ছে। হ্যাঁ, অবশেষে একদিন ঐ মাথাটাও ফেটে যাবে রক্তের চাপে। অতএব, হে ধনী! সাবধান হও (স.স.)]

অক্সফামের রিপোর্ট

বিশ্বে চলছে অবাধ অস্ত্র কেনাবেচা

অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গত এক দশকে বিভিন্ন দেশ ২২০ কোটি ডলারের বেশি অস্ত্র আমদানী করেছে। অক্সফামের এক রিপোর্টে এ তথ্য পাওয়া গেছে। মানবাধিকার গ্রুপটি জানায়, অস্ত্র বাজারে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বেশকিছু দেশ ব্যাপক আকারে অস্ত্র বাণিজ্য করেছে। এদের মধ্যে মিয়ানমার ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ৬০ কোটি ডলারের অস্ত্র ক্রয় করে। ইরান ৫৭ কোটি ৪০ লাখ ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে ২০০৭ থেকে ২০১০ এর মধ্যে। অপরদিকে অস্ত্র খাতে গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো ১২ কোটি ৪০ লাখ ডলার ব্যয় করেছে।

ভারতের ৬০ শতাংশ যেলার পানি দূষিত

ভারতের এক সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ৬০ শতাংশ যেলার পানি দূষিত হয়ে গেছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্য হ'ল ভারতের মোট ৬৩৯টি যেলার মধ্যে ৩৮৫টির পানিতেই নাইট্রেট পাওয়া গেছে, যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক। তাছাড়া ১৫৮টিতে লবণের প্রাদুর্ভাব, ২৬৭টিতে ফ্লুরাইড, ৫৩টিতে আর্সেনিক ও ২৭০টিতে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত লোহা।

মুসলিম জাহান

আদালত অবমাননা মামলায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী গিলানীর ৩০ সেকেণ্ডের প্রতীকী সাজা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গীলানী আদালত অবমাননার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আদালত গিলানীকে কোন কারাদণ্ড না দিলেও তাকে ৩০ সেকেণ্ডের প্রতীকী দণ্ড দেন। বিচারপতি নাছিরুল মুলকের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের সাত সদস্যের বেঞ্চ গত ২৬ এপ্রিল এ রায় ঘোষণা করে। রায়ে বিচারপতি নাছিরুল মুলক বলেছেন, বিধির ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করায় পাকিস্তানের সংবিধানের ৬৩ (১) (জি) ধারায় প্রধানমন্ত্রী আদালত অবমাননায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। অতএব আদালত চলাকালীন সময় পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে এজলাসে দাঁড়িয়ে থাকার দণ্ড প্রদান করা হ'ল'। এভাবে শাস্তি ঘোষণার পরপরই তিনি এজলাস ত্যাগ করেন। আর এতেই প্রধানমন্ত্রীর সাজার মেয়াদ মাত্র ৩০ সেকেণ্ডেই শেষ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা পুনরায় চালু করার অনুরোধ জানিয়ে সুইজারল্যান্ড কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখতে অস্বীকৃতি জানান গিলানী। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তোলেন সুপ্রিম কোর্ট।

আফগানিস্তানে মৃত লাশ নিয়ে মার্কিন সেনাদের উল্লাস

আফগানিস্তানে এক আত্মঘাতী হামলাকারীর লাশ নিয়ে মার্কিন সেনাদের উল্লাস ও বিকৃত ছবি তোলার চিত্র প্রকাশ করেছে মার্কিন দৈনিক লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস। ঘটনাটি ২০১০ সালে ঘটেছে বলে পত্রিকাটি জানিয়েছে। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে- এক তালেবান যোদ্ধার ছিন্নভিন্ন দুই পা দড়ি দিয়ে বেঁধে এক মার্কিন সেনা গলায় ঝুলিয়েছে আবার কেউ বিচ্ছিন্ন হাত নিয়ে কৌতুক করেছে। কেউ আবার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ভেংচি কেটে হাসছে। ইতিপূর্বে গত জানুয়ারীতে ফাঁস হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, কয়েকজন মার্কিন মেরিন সেনা তিন তালেবান যোদ্ধার লাশের ওপর প্রস্রাব করছে। এরপর ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন সেনারা আফগানিস্তানে কুরআন পোড়ানোর মতো জঘন্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ করেছে। এছাড়া মার্চ মাসে কয়েকজন মার্কিন সেনা ঠাণ্ডা মাথায় দু'টি গ্রামে হামলা চালিয়ে অন্তত ১৭ নিরীহ আফগানকে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল নারী ও শিশু।

[ধ্বংস হৌক, মার্কিন! ধ্বংস হৌক ইহুদী-নাছারা-ব্রাহ্মণ্যবাদী অশুভ চক্র! আল্লাহ তুমি এই যালেমদের প্রতিহত কর (স.স.)]

এবার সমুদ্রের তলদেশে হোটেল তৈরী করবে দুবাই!

আকাশছোঁয়া 'বুর্জ আল-খলীফা' তৈরী করে মেঘের উপর বাড়ি করার স্বপ্ন পূরণ করেছে দুবাই। সমুদ্রের উপরে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরী করে সমুদ্রের উপরিভাগও জয় করেছে তারা। এবার সমুদ্রের তলদেশে একটা শহর তৈরীর পরিকল্পনা করেছে দুবাই। লোহিত সাগরের তলদেশে বেশ কয়েকটি ডুবন্ত হোটেল তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছে শহর কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, পানির তলায় হোটেলের কিছু ফ্লোর থাকবে, আর বাকী অংশ হবে পানির উপরে। পানির উপরে থাকবে একটি ভাসমান শহর। ২০১৭ সাল নাগাদ হোটেলগুলো তৈরী হয়ে যাবে। দুবাইয়ের অর্থনীতির একটা বড় অংশ আসে পর্যটন থেকে। তাই বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য পানির নিচে এই হোটেল তৈরী করা হচ্ছে।

[বিলাসিতার পরিণাম ধ্বংস! অতএব হে বিলাসীরা! ভুলে যেয়ো না, এককালে তোমরা মেষপালক ছিলে মাত্র। আল্লাহর রহমতে আজ তোমরা তরল সোনার মালিক হয়েছ। নিজেরা তার সদ্ব্যবহার কর ও সারা বিশ্বে তোমাদের মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি আল্লাহর ঐ রহমত ছড়িয়ে দাও। তাহলে সকলে ঐ নে'মত থেকে উপকৃত হবে এবং তোমরা সকল মুসলমানের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হবে। আল্লাহ খুশী হবেন (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

খনিজ অনুসন্ধান পৃথিবীর বাইরে

পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রায় ৯ হাযার গ্রহাণু বা অ্যাস্টেরয়েড। এর মধ্যে প্রায় এক হাযার পাঁচশটিতে চাইলে যেতে পারবে মানুষ। মূল্যবান সব খনিজ উপাদানে ভরা এসব গ্রহাণু। সেগুলোর খোঁজেই এবার কাজ শুরু করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। ৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের ছোট্ট একটি গ্রহাণুতে যে পরিমাণ প্লাটিনাম থাকতে পারে তার দাম অর্থের হিসাবে প্রায় ২৫ থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ প্রায় দুই লাখ চার হাযার থেকে চার লাখ আট হাযার কোটি টাকা।

এই একটিমাত্র পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে, গ্রহাণুগুলো ঠিক কতটা মূল্যবান হতে পারে। আর সেজন্য মার্কিন কোম্পানী 'প্লানেটেরি রিসোর্সেস' এ বিষয়ে তিন বছর ধরে কাজ করছে। সম্প্রতি তারা জানিয়েছে, আগামী দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে মহাকাশে একটি টেলিস্কোপ পাঠাবে, যেটা খনিজ সম্পদে ভরপুর গ্রহাণু খুঁজে বের করবে।

[আল্লাহ বলেন, তোমরা দেখনা যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সমূহ পূর্ণভাবে দান করেছেন? (লোকমান ২০)। অতএব হে মানুষ! আল্লাহর রহমত অনুসন্ধান কর ও তাঁর শুকরিয়া আদায় কর (স.স.)]

দৃষ্টিশক্তি ফিরবে কৃত্রিম চোখে

দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টিশক্তি ফেরাতে অত্যাধুনিক বায়োনিক আই বা যান্ত্রিক চোখ তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবী করেছেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তাদের দাবী, এই বায়োনিক আই বা কৃত্রিম চোখে ব্যাটারির দরকার নেই। সোলার প্যানেল যেভাবে শক্তি যোগায় সেভাবেই আলোর সাহায্যে কাজ করবে এটি। কোন পরিবাহী তারের প্রয়োজন না থাকায় এর ফলে অনেক সহজে চোখে অস্ত্রোপচার করা যাবে। রেটিনার অসুখে যারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন তাদের আলোয় ফেরাতে বায়োনিক আই ব্যবহারে ইতিমধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখেছেন ব্রিটেন ও আমেরিকার গবেষকরা।

দেয়ালভেদ্য প্রযুক্তির দ্বারপ্রান্তে বিজ্ঞানীরা

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের চিপের ডিজাইন করেছেন। আর সেই অসাধারণ চিপের ক্ষমতা রয়েছে ঘন যেকোন বস্তুকে ভেদ করে যাওয়ার। আপনার হাতে থাকা মোবাইল ফোনে এটি ব্যবহার করা হ'লে সেই মোবাইল ফোন হয়ে উঠবে দেয়ালভেদ্য। এজন্য বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন কমপ্লিমেন্টারি মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর বা সিমোস প্রযুক্তি। এটি চার ইঞ্চি পুরু যেকোন জিনিসকে ভেদ করতে পারবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি ঘরের দেয়াল ঠিক আছে কি-না সেটি যেমন দেখতে পারবে, তেমনি জাল টাকা ধরতেও সহায়ক হবে। এমনকি ক্যান্সার টিউমারও শনাক্ত করতে পারবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন
ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শরী'আত মেনে চলুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কেশবপুর, যশোর ১৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে কেশবপুর পাবলিক ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম তাঁদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আত মেনে চলতেন। অথচ আমরা কেবল ধর্মীয় জীবনে শরী'আত মানি। সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে কথিত ধর্মনেতাদের রায়-ক্বিয়াস মেনে চলি। অন্য দিকে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিচার ব্যবস্থায় ইহুদী-নাছারা ও অন্যান্য বিধর্মীদের গোলামী করি। এক্ষণে যদি আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল চাই, তাহ'লে আমাদেরকে অবশ্যই সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুত্ত্বালিব বিন ঈমান, মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক (রাজশাহী) প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

প্রকৃত হানাফী তিনি, যিনি প্রকৃত আহলেহাদীছ

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গাংনী, মেহেরপুর ২৭ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে গাংনী বালিকা বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, চার ইমামের প্রত্যেকে বলে গেছেন, ছহীহ আমাদের মাযহাব। আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছের অনুসারী। অতএব প্রকৃত আহলেহাদীছই কেবল প্রকৃত হানাফী হ'তে পারে, অন্যেরা নয়। তিনি শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, আল্লামা তাফতাযানী, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী প্রমুখ বিদ্বানগণের উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন, প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতপূর্ণ এবং জাল-যঈফ হাদীছ ও রায়-ক্বিয়াসে ভরা হানাফী মাযহাবের সাথে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর কোনই সম্পর্ক নেই। সবই পরবর্তীদের তৈরী। যা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নামে চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক স্বার্থান্ধ কিছু নামধারী মাওলানা 'বেদয়াতী দমন কমিটি' নাম দিয়ে আমীরে জামা'আতকে এখানে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রচার করে ও লিফলেট ছড়িয়ে হানাফী জনগণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে এবং জুম'আর ছালাতের পরে তাদের সব মসজিদ থেকে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা যেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সভা বন্ধের জন্য দেন-দরবার করে। কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে ও স্থানীয় হানাফী মেয়রের দৃঢ় অবস্থানের কারণে তাদের সকল অপচেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে যায়। সম্মেলনে এত বেশী লোক সমাগম হয় যে ময়দান ছাড়িয়ে উপযেলা শহরের কোথাও গাড়ী রাখার মত খালি জায়গা পাওয়া মুশকিল হয়। বক্তব্যের শেষ দিকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, জেনে রাখুন এদেশে যদি কাউকে হানাফী বলতে হয়, তবে আসাদুল্লাহ আল-গালিবের চাইতে বড় হানাফী আর কেউ নেই'। পরে জানা যায় যে, তাঁর এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা মন্ত্রের মত কাজ করে এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে আহলেহাদীছ হওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। লিফলেট বিতরণকারী তথাকথিত 'বেদয়াতী দমন কমিটি'র নেতারা অন্ধকারে মুখ লুকায়। তারা এখন জনগণের প্রশ্নবাণে জর্জরিত।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন, শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া, কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আব্দুল ওয়াহ্হাব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর কর্মী মুহাম্মাদ রুকনুয্যামান।

মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হ'ল আল্লাহভীরুতা

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা ২৫ বৈশাখ, ৮ মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে শহরের ঐতিহ্যবাহী চিলড্রেন্স পার্কে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল আল্লাহভীরুতার। তিনি বলেন, আল্লাহ চাইলে সকল মানুষকে হেদায়াত দান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি মানুষকে পরীক্ষা করতে চান। তাই মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে।

তিনি বলেন, দেশ দুর্নীতিতে ভরে গেছে। মানুষের জান-মাল ও ইযযতের গ্যারান্টি নেই। আমাদের ছেলেরা কখনোই খুনী-ধর্ষক-মদখোর ছিল না। কিন্তু দলতন্ত্রী দুঃশাসনের কারণেই তারা আজ ক্ষমতার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে' (এ সময় বহু ছেলে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহ্র নামে তওবা করে)।

তিনি সম্প্রতি জাতীয় সংসদে পাস হওয়া আন্তঃধর্ম বিবাহ আইনের তীব্র সমালোচনা করে সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, অনতিবিলম্বে এই জংলী আইন বাতিল করুন এবং প্রতিবেশী দেশের ও বিদেশীদের গোলামী ছেড়ে নিজ দেশের জনগণের ঈমান-আক্বীদার প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করুন। তিনি বলেন, সরকারের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, ১৯৪৭ সালে এদেশ স্বাধীন হয়েছিল কেবল ইসলামের জন্য। আর সেই মানচিত্রের উপরেই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অথচ আজ মুসলমানদের নির্বাচিত সরকারগুলি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। তিনি বলেন, যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই শেরে বাংলা ফযলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং সে সময়ে নিহত, আহত ও দেশান্তরিত হাযার হাযার মুসলমানের আত্মত্যাগ ও অবদানকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত করা উচিত নয়। এটি মূলত: আমাদের পরাধীনতার সঙ্গীত। কেননা এ গান তিনি রচনা করেছিলেন একশ' বছর আগে বিভক্ত দুই বাংলাকে এক করার জন্য। আজকে যার একমাত্র পরিণতি হ'ল ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত হওয়া। যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ পরিশ্চমবঙ্গে মুসলমানদের মাইকে আযান দেবার স্বাধীনতা নেই। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুদের গান-বাজনার স্বাধীনতা রয়েছে। এসবই ইসলামের মহান শিক্ষার ফল। অতএব আমাদেরকে নতুনভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার সবক নেবার দরকার নেই।

তিনি বলেন, যদি ঈমানদার জনগণ পুনরায় আল্লাহ্র নামে জেগে ওঠে, তবে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশেই বাস্তবায়িত হবে। যেখানে তিনি বলেছেন, যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখতে পাবে যে, আল্লাহ এই ইসলামী শাসনকে এমন পূর্ণতা দান করবেন যে, একজন উষ্ট্রারোহী (ইয়ামনের রাজধানী) ছান'আ হ'তে হাযারামাউত পর্যন্ত একাকী নিরাপদে ভ্রমণ করবে। অথচ আল্লাহ ছাড়া সে কাউকে ভয় করবে না' *(বুখারী)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একজন গৃহবধু ইরাকের 'হীরা' নগরী হ'তে একাকিনী সফর করে মক্কায় যাবে। অতঃপর কা'বাগৃহ ত্বাওয়াফ করে হীরায় ফিরে আসবে। অথচ আল্লাহ ব্যতীত তার অন্তরে অন্য কারু ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড়ই তাড়াহুড়া করছ' *(বুখারী)*। তিনি সকলকে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসার এবং সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, সাতক্ষীরার ইতিহাসে এটি ছিল অন্যতম বৃহত্তম জনসমাবেশ। নারী ও পুরুষের পৃথক দু'টি বৃহৎ প্যাণ্ডেল ছিল। স্টেজের বাইরে খোলা ময়দানের কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। রাত্রি সাড়ে ১২-টায় সম্মেলন শেষ হওয়া অবধি মানুষ গভীর মনোযোগে বক্তব্য শোনে। ময়দানের বাইরে ব্যাপকভাবে মাইকের ব্যবস্থা থাকায় মার্কেটে, বাড়ীতে ও ছাদে সর্বত্র শতশত মানুষ গভীর আগ্রহে সম্মেলনের বক্তব্যসমূহ শ্রবণ করে। সম্মেলনে তেরখাদা, খুলনা, যশোর, মেহেরপুর থেকে এবং সাতক্ষীরা যেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাযার হাযার নারী-পুরুষ রিজার্ভ বাস ও অন্যান্য যানবাহনে যোগদান করে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ডঃ মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনকে সম্মান দেখিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তীর সরকারী অনুষ্ঠান উক্ত ময়দান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। এজন্য সম্মেলন কর্তৃপক্ষ ও মাননীয় প্রধান অতিথি যেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান।

আইনমন্ত্রীকে অব্যাহতি দিন

-প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমীরে জামা'আত।

বিয়ে-শাদী থেকে ধর্ম বাদ। এখন থেকে সন্তানের কোন ধর্ম পরিচয় থাকবে না। মুসলমান-কাফের পরস্পরে বিবাহ করবে ও পরস্পরের সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানের কোন ধর্ম পরিচয় থাকবে না। জাতীয় সংসদে পেশ করা আইনমন্ত্রীর এই উদ্ভট প্রস্তাব পাস হয়ে বর্তমানে তা আইনে পরিণত হয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন দেশে মানুষ সবাই স্বাধীন। রাষ্ট্র সবাইকে স্বাধীনভাবে চলার নিশ্চয়তা দিয়ে যাবে। আইনমন্ত্রীর নাম দেখে মনে হয় তিনি একজন মুসলমান। মুসলমানরা আল্লাহ্র বিধানের অধীনে জীবন যাপন করে। এই জীবন যাপনে বাধা দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। আর জনগণকে নিয়েই রাষ্ট্র। কয়েকজন নাস্তিক-সেক্যুলার মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য নিয়ে রাষ্ট্র নয়। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী কোন কাফের ও অমুসলিম নারীর সাথে কোন মুসলিম পুরুষের বিবাহ সিদ্ধ নয়। মুসলিম ও কাফির পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়। অথচ রাষ্ট্রের নাম করে আইনমন্ত্রী বশংবদ দলীয় সংসদকে দিয়ে আইন পাস করিয়ে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে চান। তাহ'লে কি তারা দেশটাকে ধর্মহীন জংলী দেশে পরিণত করতে চান? অন্য ধর্মের অনুসারীরাও এ আইন মানবে না। তাহ'লে কার জন্য এ আইন করা হয়েছে? আমরা এই কালো আইন অনতিবিলম্বে বাতিলের দাবী জানাচ্ছি এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ আইনমন্ত্রীকে দ্রুত অব্যাহতি দেওয়ার জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

[বিবৃতিটি গত ১৩ মে রবিবার দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার ৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলামে ও ১০ মে বৃহস্পতিবার দৈনিক নয়াদিগন্ত বড় শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর ১৫ তারিখের পত্রিকায় আইনমন্ত্রীর বক্তব্য আসে যে, 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমন আইন তাঁরা করবেন না'। তাকে ধন্যবাদ -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১): বলা হয় আহলেহাদীছগণ নাজাতপ্রাপ্ত দল। কিন্তু তারা এখন বহু দলে বিভক্ত। নাজাতপ্রাপ্ত কাফেলা কি দলে দলে বিভক্ত হয়? আসলে নাজাতপ্রাপ্ত দল কোন্টি?

-রবীউল ইসলাম, খুলনা।

উত্তর : প্রকৃত আহলেহাদীছ যারা, তাদের মধ্যে কোন দলাদলি নেই। কারণ আক্বীদাগতভাবে সকল আহলেহাদীছই এক। শরী'আতের ব্যাখ্যাগত বুঝের পার্থক্যের কারণে কিছু প্রশাখাগত বিষয়ে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। মতভেদ থাকলেও জামা'আতগতভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ এসেছে হাদীছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة 'তোমাদের উপর জামা'আতী যিন্দেগী ফরয করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্নতাকে নিষিদ্ধ করা হ'ল *(তিরমিযী হা/২৪৬৫)*। তবে দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে যিদ ও হঠকারিতাবশে যদি কেউ দলাদলি সৃষ্টি করে, তবে তার জন্য আল্লাহর নিকট যেকোন ব্যক্তিকেই জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে *(বাক্বারাহ ১৩৭; আলে ইমরান ১০৫; আন'আম ১৫৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের ভাষ্য অনুযায়ী কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী আহলেহাদীছগণই মাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৮৩, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৬০৩২; বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ; বিস্তারিত আলোচনা দেখুন: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' বই)*।

প্রশ্ন (২/৩২২) : স্বামীর ব্যস্ততার কারণে কোন মহিলা পূর্ণ পর্দাসহ দিনে বা সন্ধ্যার পর বাজারে গেলে ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি?

-ইসলামুল হক
কামারকুড়ি, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের একাকী বের হওয়া শরী'আতে নিষিদ্ধ *(বুখারী হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৫১৩)*। তবে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে একান্ত বাধ্যগত প্রয়োজনে মুখমণ্ডলসহ সমস্ত শরীর আবৃত করে সাবধানতার সাথে বাজারে যেতে পারে *(ফাৎহুল ক্বাদীর ৪/৩০৪, আহযাব ৫৯ আয়াতের ব্যাখ্যা; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/২২৮)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : সরকারী নিয়মানুযায়ী মাদরাসার সময়সূচী হল, সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। অনেক সময় মাদরাসা শেষ করে দুপুর ২/৩ টায় বাড়ী যেতে হয়। আবার কখনো মাদরাসায় যেতে সাড়ে দশটা বেজে যায়। এটা কি অপরাধ হবে? এর জন্য ক্বিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ বযলুর রহমান
শলুয়া, চারঘাট, রাজশাহী।

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর (ক্বিয়ামতের দিন) তোমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। তবে বাধ্যগত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : মানছূর হাল্লাজের আক্বীদা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শামীম
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর : হুসাইন বিন মানছূর বিন মাহমা আল-হাল্লাজ (২৪৪-৩০৯ হিঃ/৮৪৮-৯২২ খৃঃ) ইরানের বায়যা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াসিত্বে বড় হন। পরে বাগদাদে চলে আসেন। তিনি ভারতে যান ও সেখানে জাদু বিদ্যা শিখেন। বাগদাদে ফিরে তিনি প্রথমে 'নবী' দাবী করেন। অতঃপর সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অবস্থান সংক্রান্ত অদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রচার শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে নিজেকে 'আনাল হক্ব' (أنا الحق) বলে 'আল্লাহ' দাবী করেন। তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও কয়েদীদের মধ্যে এই কুফরী আক্বীদা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে খলীফা মুক্বতাদির বিল্লাহর সময়ে (২৯৫-৩২০হিঃ/৯০৭-৯৩২খৃঃ) দেশের সর্বোচ্চ বিদ্বানমণ্ডলীর মতামত ও বিচারকদের রায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে ৯ বছর বিভিন্ন কারাগারে বন্দী থাকার পর ৩০৯ হিজরীর ৯ই যুলক্বা'দাহ মঙ্গলবার প্রকাশ্যে তার হাত-পা ও মাথা কেটে ব্রীজের উপর ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং দেহকে আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা হয় *(আল-বিদায়াহ ১১/১৪১-১৫৪; ডঃ আমিনুল ইসলাম, ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম দর্শন পৃঃ ১২২-১২৩)*।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : অসুস্থতার কারণে ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে মুক্তাদীরা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে কি? হাদীছটির ইবারতসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছানাউল্লাহ
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তর : পারবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯)*। হুমায়দী বলেন,

إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا، هُوَ فِى مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُوْدِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ-

'যখন ইমাম বসে ছালাত আদায় করবে তখন তোমরা বসে ছালাত আদায় কর। এই অবস্থা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্বের রোগের কারণে। এরপর রাসূল (ছাঃ) বসে ছালাত আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছেন। তিনি তাদেরকে বসার আদেশ দেননি *(বুখারী হা/৬৮৯-এর সাথে সংযুক্ত; মির'আত ৪/৮৯)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : অনেকে নিয়মিত ছালাত ও ছিয়াম পালন করে। কিন্তু সর্বদা টাখনুর নীচে কাপড় পরে। অথচ হাদীছে আছে, টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তি জাহান্নামী। উক্ত ব্যক্তির পরিণাম কী হবে?

-শমশের
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাত, ছিয়াম আদায় করা সত্ত্বেও যদি কেউ টাখনুর নীচে পোশাক পরিধান করে, তাহলে অবশ্যই তার ঈমানে দুর্বলতা আছে। এরা তওবা না করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যারা টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না, তাকে ক্ষমা করবেন না এবং তার জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি *(মুসলিম হা/৩০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫)*। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ছালাত-ছিয়ামে উক্ত কবীরা গোনাহ মাফ হবে না। কেননা পাপের কারণে মুছল্লীরাও জাহান্নামে যাবে *(মাঊন ৪-৬)*। যদিও তাদের সিজদার স্থান জাহান্নাম পোড়াতে পারবে না *(বুখারী হা/৮০৬)*।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : কোন লোক যদি মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে, আর পরে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তাহলে তার পরিণতি কি হবে?

-মা'ছূম, নরসিংদী।

উত্তর : অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকের আলামত সমূহের অন্যতম *(বুখারী হা/৩৩; মিশকাত হা/৫৫)*। আর ক্বিয়ামতের দিন সফলকাম মুমিন তারাই, যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করে *(মুমিনূন ৮)*। অতএব যদি কেউ কোন ব্যক্তির দেনার দায় গ্রহণ করে তাহ'লে এ দায়িত্ব হতে সে মুক্ত হতে পারবে না *(বুখারী হা/২২৯৫-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : বাজার থেকে পণ্য কিনে অন্যের কাছে বেশী দামে বিক্রয় করলে তা বৈধ হবে কি?

-তোফাযযল
খড়খড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : প্রতারণা ও মিথ্যা কৌশল থেকে মুক্ত হলে এ ধরনের ব্যবসা বৈধ হবে *(মুসলিম হা/২৯৪; মিশকাত হা/৩৫২০)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩২৯): কোন মহিলা স্বামীর অজান্তে আত্মীয়দের মাঝে দান করে থাকে। আত্মীয়রা স্বামীর কাছে ছোট এবং লজ্জিত হবে বলে স্বামীকে জানানো হয় না। এরূপ দান কি শরী'আত সম্মত হবে?

-আসমা
কামারকুড়ি, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : স্বামীর সংসারের ক্ষতি না হলে এবং এরূপ দানে স্বামী সন্তুষ্ট থাকবে বলে মনে করলে উক্ত দান শরী'আত সম্মত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, স্ত্রী তার স্বামীর খাদ্য সামগ্রী হতে ছাদাক্বা করলে এবং তাতে বিপর্যয়ের উদ্দেশ্য না থাকলে সে ছওয়াব পাবে। উপার্জন করার কারণে স্বামীও ছওয়াব পাবে এবং মালের পাহারাদারও অনুরূপ ছওয়াব পাবে *(বুখারী হা/১৪৩৭; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩০) : যার পীর নেই তার পীর শয়তান। এধরনের আক্বীদা পোষণ করা যাবে কি?

-আল-আমীন
ফরিদপুর।

উত্তর : এটা কুফরী আক্বীদা। ইসলামে পীরের কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) কোন পীরের অনুসরণ করার নির্দেশ দেননি। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর' *(নিসা ৫৯)*। যিনি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬২ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*। 'পীর' এদেশে ছূফীদের একটি উপাধি। প্রাচীন ও আধুনিককালে মুসলমানদের তাওহীদ বিশ্বাসে ফিৎনা সৃষ্টির সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ'ল ছূফীবাদ। অতএব এইসব মতবাদ থেকে সাবধান!

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : জনৈক আলেম বলেন, মহিলাদের জন্য গলায় হার, হাতে আংটি, নাকে নাকফুল দেওয়া জায়েয নয়। কারণ নাকে নাকফুল দিলে নাকে পানি প্রবেশ করে না। তাই তাদের ওযূ হয় না এবং ছালাতও হয় না। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-মুনমুন
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত দাবী সঠিক নয়। মহিলারা গহনা ও অলংকার পরিধান করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত ও খুৎবা প্রদানের পর মহিলাদের নিকট গিয়ে নছীহত করলেন ও তাদের ছাদাক্বা করার উপদেশ দিলেন। ফলে তারা কান ও গলার গহনা খুলে বেলালের নিকট দিতে লাগলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯)*। সুতরাং গহনা পরা যাবে এবং তা পরিহিত অবস্থায় ওযূ করাও যাবে। গহনা ওযূর কোন ক্ষতি করবে না। কারণ শরী'আতে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশনা নেই। উল্লেখ্য যে, হাতে আংটি থাকলে ওযূর সময় নড়াচড়া করতে হবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(দারাকুৎনী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪২৯)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : জনৈক ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন মাদরাসার নাম উল্লেখ না করে বলেছেন, মাদরাসার নামে এই জমি দান করলাম। বর্তমানে ঐ ব্যক্তি বেঁচে নেই। এখন তার ওয়ারিছগণ উক্ত জমিতে ঈদগাহ বানাতে চায়। এটা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
জগন্নাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মাদরাসায় দান করার কথা বলার কারণে উক্ত জমি যে কোন মাদরাসায় দিতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'হেবা' অনুচ্ছেদ)*।

মাদরাসা বলতে কেবল ঐগুলিকে বলা হয়, যেখানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে দ্বীনী ইলমের নামে যেখানে শিরক, বিদ'আত ও ছূফীবাদ শিখানো হয়, সেগুলি আদৌ কোন মাদরাসা নয়। বরং এগুলি ইসলাম ধ্বংসের আখড়া মাত্র। আল্লাহ বলেন, তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও সীমালংঘনের কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ২)*। অতঃপর মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে মাদরাসার মাঠে ঈদের ছালাত আদায় করা যাবে।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : সমাজে অনেক বিত্তশালী লোক রয়েছেন যারা প্রতি বছর হজ্জ পালন করেন এবং সময় পেলেই ওমরাহ করতে যান। কিন্তু গরীব আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখেন না। ইসলামের দৃষ্টিতে উক্ত হজ্জ ও ওমরার অবস্থা কী হবে?

-আবুল কাসেম
শিবপুর, কালীগঞ্জ।

উত্তর : বার বার হজ্জ ও ওমরাহ না করে দরিদ্র ও অসহায় পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের মাঝে অর্থ দান করা উত্তম *(ফাতাওয়া ওছায়মীন, ২১/২৮ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যে পেট ভরে খায়। অথচ তার তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩১১৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৯; মিশকাত হা/৪৯৯১)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : জুম'আর ছালাতের পূর্বে যে চার রাক'আত সুন্নাত পড়া হয় তা কি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা?

-আব্দুল আলীম
পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : জুম'আর ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করা সম্পর্কে ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১১২৯)*। তবে খত্বীব মিম্বরে বসার আগ পর্যন্ত যত রাক'আত খুশী নফল ছালাত আদায় করা যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৮, ১৩৮৪, ৮৭)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : সর্বপ্রথম কোন ছাহাবীর জানাযা হয় এবং সেই জানাযার ছালাতে কে ইমামতি করেন?

-ইনামুল হুদা
সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মাদানী জীবনে প্রথম জানাযার বিধান জারি হয়। ১লা হিজরীর শাওয়াল মাসে বদর যুদ্ধের পূর্বে খ্যাতনামা আনছার ছাহাবী আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ) অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং ১ম ছাহাবী হিসাবে বাক্বী' গোরস্থানে কবরস্থ হন। তিনিই ছিলেন ১ম মাইয়েত, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যার জানাযা পড়েন' *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক : ১১১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৯০, টীকা-৮৭০)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : কোন কোন ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ?

-মুহাম্মাদ মুবীনুল ইসলাম
ছায়ানীড়, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : (১) অত্যাচারীর অত্যাচার প্রকাশ করার জন্য (২) সমাজ থেকে অন্যায় দূর করা এবং পাপীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য (৩) হাদীছের সনদ যাচাই ও ফৎওয়া জানার জন্য (৪) মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করা ও তাদের মঙ্গল কামনার ক্ষেত্রে (৫) পাপাচার ও বিদ'আতে লিপ্ত হলে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে (৬) প্রসিদ্ধ নাম ধরে পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২৫৬ অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৫৭৫)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : প্রবাসী ছেলের জন্য মৃত মায়ের জানাযা ও দাফন কার্য ভিডিও করে সংরক্ষণ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন ছবি পেলে তাকে ধুলিসাৎ করে দাও' *(মুসলিম হা/৯৬৯)*। তাছাড়া এতে কোন কল্যাণ নেই। বরং মায়ের অদৃশ্য স্মৃতি বুকে ধারণ করে তার জন্য প্রাণভরে দো'আ ও ছাদাক্বা করার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : আমি এবং আমার এক আত্মীয় একটি জমি ক্রয় করি। কিন্তু সে চক্রান্ত করে জমিটি তার নামে দলীল করে নেয়। ঐ জমির মূল্য দাবি করলে সে তা দিতে অস্বীকার করে। এতে সম্পর্ক নষ্ট হয়। এ জন্য দায়ী হবে কে?

-ছিয়াম সারোয়ার
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : প্রতারণাকারী ব্যক্তিই দায়ী হবে। কারণ সে দু'টি অন্যায় করেছে। একটি হচ্ছে অন্যের সম্পদ নিজ নামে করে নেওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জমি ফেরত না দেওয়া। উক্ত দু'টি অন্যায়ই বান্দার হকের সাথে জড়িত, যা বান্দা ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করেন না *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*। এক্ষণে ঐ ব্যক্তিকে জমি ফেরত দিতে হবে বা বর্তমান বাজার মূল্য প্রদান করতে হবে। অতঃপর তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। তবে উভয়ের মধ্যে সালাম-মুছাফাহা অব্যাহত রাখতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৫০২৭)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : জামে মসজিদের জন্য বিভিন্ন দাতা কয়েক বছর পূর্বে জমি দান করেন। বর্তমানে মসজিদের সংস্কার কাজ চলছে। অর্থ সংকটের কারণে জমিগুলো বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু জমিগুলোর কাগজ সঠিক না হওয়ায় বাইরের লোক তা ক্রয় করতে চাচ্ছে না। এমতাবস্থায় যারা দান করেছেন, তাদের কাছে বিক্রয় করা যাবে কি? অথবা এ জন্য করণীয় কী?

-মসজিদ কমিটি
হলাকান্দর, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : মসজিদের জমি যদি কেউ ক্রয় করতে না চায়, তবে মসজিদ সংস্কারের স্বার্থে জমি দাতা নিজে তা ক্রয় করে নিতে পারেন *(ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ, ৩১/২১৬)*।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ না বললে ওযূ হবে কি?

-হাফীযুর রহমান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : ওযূর শুরুতে যে 'বিসমিল্লাহ' বলবে না তার ওযূ হবে না *(আবুদাঊদ হা/১০১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৮, সনদ হাসান ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : বিয়ে বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভিডিও করা যাবে কি? টেলিভিশন দেখা কি শরী'আত সম্মত হবে?

-আমানুল্লাহ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : বিয়ে অনুষ্ঠান ভিডিও করা যাবে না। কারণ এটি স্রেফ সখ মাত্র। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভিডিও করা যায় সেখান থেকে ধর্মীয় উপদেশ লাভের জন্য।

বর্তমান টিভি চ্যানেলগুলিতে পাপের অংশই বেশী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আদম সন্তানের উপর ব্যভিচারের একটি অংশ নির্ধারিত আছে। চোখের যেনা দেখা, কানে যেনা শ্রবণ করা, মুখের যেনা কথা বলা, হাতের যেনা স্পর্শ করা, পায়ের যেনা চলা এবং অন্তরের যেনা কল্পনা করা *(মুসলিম হা/৬৯২৫; মিশকাত হা/৮৬)*। অশ্লীল ছবি দেখা, গান বাজনা শ্রবণ করা এবং মুখে বলা ইত্যাদির মাধ্যমে যেনার মত নোংরামি ছড়াচ্ছে। অতএব এসব থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : খুলনা দারুল উলূম মাদরাসার মুফতীগণ ফাতাওয়া দিয়েছেন যে, 'মক্কার যারা মুক্বীম তারা হজ্জ করলে মদীনা-আরাফা-মুযদালিফায় সময় মত ছালাত পড়বে এবং ক্বছর করতে পারবে না (ফাতাওয়া আলমগীরী ১ম খণ্ড ১৩৯ পৃঃ; হেদায়া ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ; মাহমূদিয়া ১ম খণ্ড ৩৬৯ পৃঃ)। উক্ত ফাতাওয়া কি সঠিক হয়েছে?

-এম.এ. মজীদ, খুলনা।

উত্তর : উক্ত ফৎওয়া সঠিক নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ), আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) মিনাতে ছালাত ক্বছর করে করতেন। মক্কার স্থানীয় ব্যক্তিরাও তাঁদের সাথে ক্বছর করতেন। তবে ওছমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতের প্রথমদিকে ক্বছর করতেন এবং পরবর্তীতে পুরা পড়তেন *(বুখারী হা/১০৮২; মুসলিম হা/১৬২৪; মিশকাত হা/১৩৪৭ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। এটি ছিল ওছমান (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত আমল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, তোমাদের মাঝে যদি কোন বিষয়ে মতানৈক্য হয়, তাহলে তোমরা ফিরে যাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে *(নিসা ৫৯)*। আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বলেন, আমি যখন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-কে ওছমান (রাঃ)-এর পুরো ছালাত পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, আমার জন্য দুই রাক'আত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হওয়া চার রাক'আতের চাইতে বেশি পসন্দনীয় *(ক্বাযী আয়ায, ইকমালুল মু'আল্লিম শরহ ছহীহ মুসলিম ৩/১২)*।

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের সফরে মক্কায় দুই রাক'আত ছালাত পড়ার পর বললেন, (يا أهل البلد، صلوا اربعا، فإنـــا سَــفْرٌ) 'হে নগরবাসীগণ! তোমরা চার রাক'আত পড়। কারণ আমরা মুসাফির' *(আবুদাঊদ হা/১২২৯; মিশকাত হা/১৩৪২)* বর্ণনাটি 'যঈফ'। এর সনদে আলী বিন যায়েদ বিন জুদ'আন নামে একজন যঈফ রাবী আছেন *(ফাৎহুল বারী ৪/৪৭; সিয়ার নুবালা, ক্রমিক ৮২, ৫/২০৬)*। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরাফা ময়দানে অবস্থানকালে এক আযানে ও দুই ইক্বামতে যোহর ও আছর জমা তাক্বদীম করেন। মুক্বীম-মুসাফির সকলে তাঁর সাথে একইভাবে ছালাত আদায় করেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৬১৭ 'হজ্জ' অধ্যায়; আবুদাঊদ হা/১৯১৩)*। মুযদালেফাতেও মাগরিব ও এশা জমা তাখীর করেছিলেন। আগে-পিছে কোন সুন্নাত পড়েননি *(বুখারী, মিশকাত হা/২৬০৭; মুসলিম হা/১২৮৮)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এটি ফক্বীহ বিদ্বানগণের মধ্যে ইজমা-এর ন্যায়' *(আলবানী, মানাসিকুল হজ্জ ওয়াল ওমরাহ পৃঃ ২৯ টীকা-৬৪)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার বার একই শিক্ষক দ্বারা কমিটি গঠন করা হয়। যেখানে আর্থিক সম্মানীর ব্যবস্থা রয়েছে। এতে অন্য শিক্ষকগণ অসন্তুষ্ট থাকেন। এভাবে বান্দার হক বিনষ্টের কারণে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ
ফজিলা রহমান মহিলা কলেজ
পিরোজপুর।

উত্তর : যদি প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে বিভিন্ন মেয়াদে পৃথক পৃথক শিক্ষক থাকার বিষয়টি আবশ্যিক থাকে, তবে প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী হবেন। আর তা না থাকলে কমিটির পরামর্শে প্রধান শিক্ষক যাকে যোগ্য মনে করবেন তার নাম প্রস্তাব করতে পারেন। এতে একই শিক্ষক একাধিকবার আসতে পারেন। আর যদি প্রতিষ্ঠান প্রধানের এতে কোন প্রতারণা বা কারসাজি থাকে এবং তিনি যোগ্যতার মূল্যায়ন না করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*। কেননা রাসূল (ছাঃ) হকদারকে তার হক দিতে বলেছেন *(বুখারী হা/১৯৬৮)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০১১ সংখ্যায় 'পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী' প্রবন্ধে উযযা মূর্তি চূর্ণ করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, উয্যা একটি মূর্তির নাম। যার প্রাণ নেই, হাঁটা চলার শক্তি নেই। তাহ'লে খালেদ যে নগ্ন মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখেন এবং দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন আসলে সেটি কি ছিল?

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
সোহাগদল, পিরোজপুর।

উত্তর : ওটা নারী জিন ছিল। উযযা মূর্তির রূপ ধরে মহিলা জিন মূর্তিপূজা করার জন্য উৎসাহ দিত। এজন্য রাসূল (ছাঃ) উক্ত নগ্ন নারী জিনকে প্রকৃত উযযা বলেছেন *(নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৪৭)*। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক মূর্তির সাথে একজন করে নারী জিন থাকে' *(আহমাদ হা/২১২৬৯)*। যে মানুষকে তার দিকে প্রলুব্ধ করে।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : আমরা জানি ১২০ দিন তথা ৪ মাস পরে মাতৃগর্ভে ভ্রূণে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়। এর পূর্বে যেকোন মাধ্যমে ঐ ভ্রূণ ফেলে দিলে গোনাহ হবে কি?

-ডাঃ মুহসিন
হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শের আলোকে যদি মায়ের জীবনের হুমকি থাকে তাহলে গর্ভস্থিত ভ্রূণ ফেলে দেয়া জায়েয। অন্যথায় শরী'আতের দৃষ্টিতে গর্ভপাত করা হারাম *(বাক্বারাহ ২০৫)*। আর দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা হলে তা হবে আরো বড় পাপ *(বনু ইসরাঈল ৩১)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : জনৈকা মহিলা ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার আগেই স্বামীর সাথে সহবাস করে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-ইসমাঈল
সখিপুর, গাজীপুর।

উত্তর : এজন্য তাদেরকে তওবা করতে হবে এবং এক দীনার বা অর্ধ দীনার ছাদাক্বা করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/২৬৪; মিশকাত হা/৫৫৩)*। এটি ছিল নবী যুগের স্বর্ণমুদ্রার নাম। এখন সেখানে তা নেই। অতএব স্ব স্ব দেশের মুদ্রায় কিছু ছাদাক্বা করা উত্তম। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, নির্দেশটি 'মানদূব' পর্যায়ের। ওয়াজিব পর্যায়ের নয়' *(মির'আত ৩/২৫১)*। অতএব কঠিনভাবে তওবা করাই কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : টাকার যাকাত নির্ধারিত হবে কিভাবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : সোনা-চাঁদীর নিছাব অনুযায়ী টাকার যাকাত নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ বর্তমান ওযন অনুযায়ী ৮৫ গ্রাম সোনা এবং ৫৯৫ গ্রাম চাঁদী। প্রয়োজনীয় খরচ বাদে যা অবশিষ্ট থাকবে এবং এক বছর তার উপর অতিবাহিত হলে সঞ্চিত টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। শতকরা আড়াই ভাগ হিসাবে *(ইবনে মাজাহ হা/১৭৮০)*। স্বর্ণের মূল্যমান রূপা অপেক্ষা স্থিতিশীল এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য বিধায় অধিকাংশ বিদ্বান স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে স্বামীর সমস্যার কারণে সন্তান হচ্ছে না। এমতাবস্থায় স্বামীর নিকট থেকে তালাক নিয়ে অন্যত্র বিবাহ করা যাবে কি?

-নওরীণ জাহান
সাভার, ঢাকা।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে সন্তান আসে। কিন্তু মিলন হলেই সন্তান হবে এমনটি নয়। কারণ এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে *(শূরা ৪৯-৫০)*। তাছাড়া অন্যত্র বিবাহ হলে সন্তান হবেই মর্মে কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই ধৈর্যধারণ করে স্বামীর সাথে জীবন-যাপন করাই ভাল হবে। কারণ নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে অকারণে তালাক চায় তার উপর জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম হয়ে যাবে' *(আবুদাঊদ হা/২২৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩২৭৯)*। উল্লেখ্য যে, চিকিৎসার মাধ্যমে যদি স্বামীর দুর্বলতা না সারে, তাহলে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে 'খোলা'-র মাধ্যমে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : আমরা (৬) ছয় বোন ও চার (৪) ভাই। বাবা-মা উভয়েই বেঁচে আছে। আব্বার নামে ২৪ ও মায়ের নামে ২ বিঘা মোট ২৬ বিঘা জমি আছে। ভাইয়েরা জমি বোনদেরকে দিতে চাচ্ছে না। মায়ের জমিটুকু দিতে চাচ্ছে। উক্ত সম্পত্তির মধ্যে কে কতটুকু পাবে? আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বণ্টন না করলে তার পরিণাম কী জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আয়েশা খাতুন
হাজরাপুকুর, রাজশাহী।

উত্তর: ওয়ারিছগণ কে কতটুকু পাবে তা স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারন করে দিয়েছেন *(নিসা ৭, ১১)*। কিন্তু সেটা পাবে মৃত্যুর পরে, আগে নয়। তবে কেউ যদি জীবিত অবস্থায় বন্টন করতে চায়, তাহলে অবশ্যই সব ওয়ারিছকে অংশ মত দিতে হবে। তবে এটা হ'তে হবে সাময়িক ভিত্তিতে কেবল মৌখিকভাবে। কারণ চূড়ান্ত ভাগবন্টন হবে মৃত্যুর পরে ইসলামী শরী'আত মতে। প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়ে ছেলেদেরকে মেয়েদের দ্বিগুণ নীতির ভিত্তিতে মা ও বাপ উভয়ের ২৬ বিঘা জমি ১৪ ভাগে ভাগ করে ছেলেরা পাবে দুই ভাগ, আর মেয়েরা পাবে এক ভাগ করে। বোনদেরকে তাদের প্রাপ্য হক থেকে মাহরূম করা নিঃসন্দেহে কাবীরা গুনাহ এবং তা অন্যের হক আত্মসাতের শামিল। তারা ক্ষমা না করলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত পাপ ক্ষমা করবেন না *(বুখারী হা/২৪৪৯ 'অত্যাচার ও আত্মসাত' অধ্যায় ৪৬, ১০ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : কোন মুছল্লী মাগরিবের ছালাতে গিয়ে যদি দেখে ইমাম ২য় রাক'আতে সূরা ফাতেহা শেষ করে অন্য সূরা পাঠ করছেন। উক্ত অবস্থায় ঐ মুছল্লী কি শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে? না ছানা পাঠ করে সূরা ফাতেহা পড়বে? অথবা সে শেষ রাক'আত পেয়েছে। ইমামের সালামের পর সে এক রাক'আত করে পড়বে, নাকি দু'রাক'আত এক সাথে পড়বে?

-আনোয়ার, রংপুর।

উত্তর: উক্ত অবস্থায় শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে *(বুখারী হা/৭৫৭; মুসলিম হা/৫০৭)*। আর ইমাম সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে এক রাক'আত পড়ে বৈঠক করবে। অতঃপর আরেক রাক'আত পড়ে বৈঠক শেষে সালাম ফিরাবে। পিছনে আসা ব্যক্তি ইমামের সাথে যে রাক'আত পাবে সেটাই তার প্রথম রাক'আত বলে গণ্য হবে *(বুখারী হা/৬৩৫; মুসলিম হা/১৩৮৯)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : হানাফী মসজিদে ছালাত আদায় করলে ইমামের দ্রুত পড়ার কারণে ছালাতে একাগ্রতা আসে না। তাছাড়া ফজর, যোহর, আছর ছালাত তারা অনেক দেরীতে পড়ে। এক্ষেত্রে একাকী আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ডাঃ মামূন, নওগাঁ।

উত্তর : এ ধরনের মসজিদে ছালাত আদায় করার কারণে ছালাতে একাগ্রতা নষ্ট হলে ইমাম পাপী হবে। তবে মুক্তাদীর

ছালাত হয়ে যাবে *(বুখারী হা/৬৯৪; মিশকাত হা/১১৩৩ 'ইমামের কর্তব্য' অনুচ্ছেদ)*। আর ছালাতের সময় হয়ে গেলে একাকী আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে নিতে হবে। পরে তাদের সাথে পড়তে সক্ষম হলে শামিল হওয়া যাবে। তবে পরবর্তী ছালাতটি নফল বলে গণ্য হবে *(মুসলিম হা/১৪৯৭)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : চুল ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা করা কি শরী'আত সম্মত? মহিলাদের মাথার চুল আঁচড়ানো পর চিরুনীতে যে চুল উঠে তা বিক্রয় করা যাবে কি?

-নাসীমা আখতার
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : চুল ক্রয়-বিক্রয় করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ যা সংযুক্ত থাকা অবস্থায় বিক্রি করা নাজায়েয, তা পৃথক হওয়ার পরও নাজায়েয। মানুষের চুল তার অন্যতম। এর দ্বারা মানুষের মর্যাদার হানি হয় *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/২৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : শিরক এবং বিদ'আতকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কেমন শাস্তি দিবেন? শিরক ও বিদ'আত হতে বাঁচার উপায় কি?

-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
বোয়ালকান্দি, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : শিরক ও বিদ'আত দুইটিই জঘন্য অপরাধ। যদি উক্ত পাপ হতে তওবা না করে কেউ মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দিবেন। যেমন শিরক সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। আর তার স্থান হবে জাহান্নামে। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য আখেরাতে কোন সাহায্যকারী থাকবে না *(মায়েদাহ ৭২)*। অতঃপর যারা বিদ'আতী তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে মানুষের তৈরি বিধানের আনুগত্য করে। যারা আল্লাহ্র রাসূলের বিধান মানবে না, তারা মুমিন হতে পারবে না *(নিসা ৬৫)*। বিদ'আতীরা হাউয কাওছারের পানি পান করার সুযোগ পাবে না এবং রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতও পাবে না *(মুসলিম হা/৪২৪৩)*। অবশেষে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

অতএব যাবতীয় কর্ম এবং ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করলে শিরক থেকে বাঁচা সম্ভব। অনুরূপ দলীলবিহীন ও জাল-যঈফ হাদীছভিত্তিক আমল ত্যাগ করে শুধু ছহীহ দলীল ভিত্তিক আমল করলে বিদ'আত থেকে বাঁচা সম্ভব।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এলাকার ইমামদের বেতন দিয়েছেন কি? ইমামগণ বেতন নিলে গুণাহগার হবেন কি? আল্লাহ বলেন, কুরআনকে স্বল্প মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় কর না। এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

-মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহ
রাজপাট, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : কুরআন শিক্ষা দিয়ে, ইমামতি করে, আযান দিয়ে, দ্বীনী তা'লীম দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয আছে। তবে অর্থ গ্রহণ যেন উদ্দেশ্য না হয়। উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে বস্তুর উপর তোমরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৫)*। উক্ত হাদীছে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করে ছাহাবীগণ খাদ্য হিসাবে বিনিময় গ্রহণ করেছেন সে কথাও উল্লেখ রয়েছে।

রাসূল (ছাঃ) আবূ মাহ্যূরাকে আযান শেষে একটি রূপার থলি প্রদান করে তার জন্য বরকত কামনা করে দো'আ করেন *(নাসাঈ হা/৬৩২; ইবনু মাজাহ হা/৭০৮)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) আযানের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না তাকে মুয়াযযিন হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছেন *(নাসাঈ হা/৬৭২; তিরমিযী হা/২০৯)*। এর অর্থ হচ্ছে, যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করার শর্ত দিবে। যেমন বলল, এ পরিমাণ টাকা না দিলে আমি ইমামাতি করব না, আযান দিব না, কুরআন পড়াবো না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছায় প্রদান করলে তাতে কোন দোষ নেই *(শানক্বীত্বী, শারহু যাদুল মুসতাক্বনি' ৯/১৪৯)*।

এগুলিতে বিনিময় গ্রহণ করা কুরআনকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। ইহুদী-নাছারা ধর্মনেতারা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের কিতাবের শব্দ বা অর্থ পরিবর্তন করে ফেলত এবং তার বিনিময়ে লোকদের নিকট থেকে অর্থ উপার্জন করত। আল্লাহ একে তাচ্ছিল্যভরে 'স্বল্পমূল্যে বিক্রয়' বলে অভিহিত করেছেন *(তাফসীর কুরতুবী, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। অতএব ইসলামী শারী'আতের কোন বিধানকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে যদি কেউ ঘুষের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করে তাহলে তা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : এমন কোন আমল আছে কি যার দ্বারা কবরের চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : কবরের মাটির চাপ থেকে সৎ অসৎ, মুসলিম অমুসলিম কেউ রক্ষা পাবে না *(আহমাদ হা/২৪৩২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৯৫)*। তবে সবার চাপ একই ধরনের হবে না। মুমিন ব্যক্তি এই চাপে শান্তি অনুভব করবে।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : আমরা এতদিন যাবত 'দুই সিজদার' মাঝের দো'আ নীরবে পড়ে আসছি। কিন্তু 'আহলে হাদিস দর্পণ' ৮ম বর্ষ, ২০/০৪-০৫ইং ডিসেম্বর-জানুয়ারী সংখ্যা ১৩-১৪ পৃষ্ঠায় হাদিসের আলোকে লেখা হয়েছে দুই সিজদার মাঝের দো'আ সরবে পড়তে হবে এবং আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী...' দো'আটি যঈফ। উক্ত বিষয়ে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোলায়মান
বোয়ালকান্দি, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: যে দো'আর সাথে অন্যরা 'আমীন' বলে যেমন কুনূতে নাযেলা, এস্তেস্কার দো'আ ইত্যাদি ব্যতীত বাকী সকল দো'আ নীরবে পড়া উচিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা প্রতিপালককে মনে মনে বিনয় ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে ডাক' *(আ'রাফ ২০৫)*। প্রশ্নে উল্লেখিত দো'আটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আবুদাঊদ হা/৭৯৬; তিরমিযী হা/২৮৪)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : ছাগল, গরু, মহিষ, ভেড়া প্রভৃতি পশুর চামড়া খাওয়া যাবে কি?

-ডঃ মুহাম্মাদ আলী
সহকারী অধ্যাপক, জামনগর ডিগ্রী কলেজ
নাটোর।

উত্তর : যবহকৃত হালাল পশুর প্রবাহিত রক্ত ব্যতীত সবই হালাল *(আন'আম ১৪৫)*। হানাফী কিতাব সমূহে আরো ছয়টি বস্তু হারাম বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু সেগুলি সব ক্বিয়াসী বা অনুমান নির্ভর। সুতরাং হালাল পশুর চামড়া যদি কেউ খেতে চায়, খেতে পারে। তবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সবকিছু থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং ক্ষতি করো না *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। কেননা এতে খাদ্য গ্রহণের লক্ষ্য ব্যাহত হয় *(ফৎহুল ক্বাদীর বাক্বারাহ ১৬৮; মায়েদাহ ৮৮; আনফাল ৬৯; নামল ১১৪)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার কলবের ভিতর অবস্থান করেন। আর মুমিন বান্দার কলব হল আল্লাহ্র আরশ।' এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। হে আল্লাহ তোমার রহমত ও গুণসমূহের অসীলায় আমাকে আরোগ্য দান কর। এভাবে দো'আ করা যাবে কি?

-আব্দুল আলীম
এ.এইচ. রিভারভিউ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত মর্মে সমাজে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তা ভিত্তিহীন *(সিলসিলা যঈফাহ হ/৫১০৩)*। এবিষয়ে সঠিক আক্বীদা হল, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নীত। এ সম্পর্কে কুরআনে সাতটি আয়াত বয়েছে *(সূরা ইউনুস ৩; আ'রাফ ৫৪; ত্বোয়াহা ৫; ফুরক্বান ৫৯; সাজদাহ ৪; হাদীদ ৪)*। একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারাও তা প্রমাণিত *(মুসলিম হা/১২২৭; বুখারী হা/৭৪২৩)*। তবে আল্লাহ তাঁর ইলম ও কুদরতের মাধ্যমে সকলের সাথে থাকেন। যেমন তিনি মূসা ও হারূণকে বলছেন, لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'ভয় করো না। আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনছি ও দেখছি *(ত্বোয়াহা ৪৬)*।

আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর অসীলায় দো'আ করা যাবে। যেমন, يا رحيم ارحمنى، يا رزاق ارزقنى، يا هادى اهدنى، يا ناصر انصرنى 'হে দয়ালু! আমাকে দয়া কর। হে রূযীদাতা! আমাকে রূযী দাও। হে পথ প্রদর্শক! আমাকে সুপথ দেখাও। হে সাহায্যকারী! আমাকে সাহায্য কর' ইত্যাদি। এভাবে অর্থ বুঝে দো'আ করলে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় ও দেহমনে শক্তি আসে। বস্তুতঃ ছিফাতী নামগুলি আল্লাহ্র একত্ববাদ, তাঁর দয়া, দানশীলতা ও সর্বোচ্চ শক্তি হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে তোমরা সেগুলির মাধ্যমে আল্লাহকে ডাক *(আ'রাফ ১৮০)*।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : আলমে বরযখ কী? বরযখ এবং আখেরাতের জীবন কি একই?

-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
বোয়ালকান্দি, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: বরযখ শব্দের অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী। শরী'আতের পরিভাষায় মৃত্যর পর হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়কালকে বরযখ বলা হয়। এটা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মধ্যেকার প্রাচীর। আল্লাহ বলেন, তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত *(মু'মিনূন ১০০)*। ক্বিয়ামতের পর থেকে আখেরাতের জীবন শুরু। যেহেতু আখেরাতই শেষ জীবন, তাই তাকে আখেরাত বা শেষদিবস বলা হয় *(তাফসীর ত্বাবারী, বাক্বারাহ ৮ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। তারপর যার নেকী বেশি হবে সে যাবে জান্নাতে, আর যার গুনাহ বেশি হবে, সে যাবে জাহান্নামে *(সূরা আল-ক্বারি'আহ ৬-১১)*। সুতরাং বরযখ ও আখেরাত পৃথক বিষয়।